LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৯ বর্ষ ■ ১৭তম সংখ্যা

১ চৈত্র, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ ■ ২৪ সফর, ১৪২৮ হিজরি
১৫ মার্চ, ২০০৭ ঈসাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

মার্চ মাস প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জাতির কাছে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন মাস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিগুলোও নিজ জাতি সত্তার সাথে এ মাস বা এ মাসের বিশেষ দিনকে ঐতিহাসিকভাবে সম্পর্কযুক্ত করে নিয়েছে। যেমনটি আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের **'মহান স্বাধীনতা দিবস'** হিসেবে **'২৬ শে মার্চ'** দিনটিকে নির্ধারণ করে নিয়েছি। আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসী সকলকে রইল আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

সেই সাথে সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে মার্চ মাসের বিশেষ একদিনের কথা সবিনয়ে জানাতে চাই। যে দিনটিতে মহান আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত কৃপাভরে তাঁর এক বিনীত বান্দাকে, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরিপূর্ণ আনুগত্যে ও ভালবাসায় বিলীনতার কারণে, শেষ যুগের মামুর (প্রত্যাদিষ্ট) হিসেবে সত্যান্বেষী ও সত্যপ্রিয় মানুষদেরকে একত্রিত করে তাদের থেকে বয়'আত গ্রহণের দিন হিসেবে নির্ধারণ করে দেন। আর সেদিনটি ছিল ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সাল। ঐ দিনে প্রত্যাদিষ্ট হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী জামানায় আবির্ভূত **'ইমাম মাহদী'র** দাবী নিয়ে লুধিয়ানার (হাদীসে বর্ণিত বাবে লুদ) মহল্লা জদীদে সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে আনুষ্ঠানিক বয়'আত গ্রহণের কার্য্যক্রম শুরু করেন। এভাবে মু'মিন মুসলমানদের সমন্বয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের গোড়াপত্তন হয় সেই ঐতিহাসিক দিনে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত মু'মিন মুসলমানদের এই জামাত খেলাফতের আশীষময় ধারাকে ধারণ করে বর্তমানে ১৮৭টিরও অধিক দেশে সগৌরবে ইসলামের পূর্ণবিজয় ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করে সদা অগ্রসরমান।

এই অগ্রযাত্রায় নব গতি সঞ্চারিত করে এখন খিলাফতে খামেসা (৫ম খেলাফত)-র বিজয় কেতন সমগ্র বিশ্বকে সত্য গ্রহণে আন্দোলিত, আলোড়িত ও উজ্জীবিত করে চলছে। অতি সম্প্রতি উম্মুল মু'মেনীন-মা খাদিজার পূণ্য-স্মৃতি পাশ্চাত্য জগতে চিরজাগরুক রাখতে জার্মানীর পূর্ব বার্লিনে ভিত্ রাখা হয়েছে **'মসজিদে খাদিজা'-র**। সেখান থেকেও তৌহীদ ও রেসালতের শ্বাশ্বতবাণী উচ্চকিত হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে–

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্.....

সুপ্রিয় পাঠক, তৌহীদের এই অগ্রযাত্রায় আপনাকেও পবিত্র হৃদয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

১৫ মার্চ, ২০০৭

সূচীপত্র *পৃষ্ঠা নং*

- পবিত্র কুরআন ৪
- হাদীস শরীফ ৫
- অমৃতবাণী ৬
- জুমুআর খুতবা ঃ বিভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহ্ তাআলার 'সিফতে রাব্ব' এর উপর জ্ঞানগর্ভ আলোকপাত ৭-১২
  হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ : বাংলাডেস্ক, লন্ডন
- আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক মহান নাম সমূহ ১৩
  মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম
- মানবতার আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ১৪-১৭
  মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মুবাশ্বের মুরব্বী
- ঈশ্বরনিন্দা (Blasphemy) ১৮-২০
  মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ
  খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)
  অনুবাদ ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
- সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও ২৩শে মার্চ ২১-২৫
  মাহমুদ আহমদ সুমন (মোয়াল্লেম)
- সুন্দরবনে আহমদীয়াত এক ঐশীবাণী পূর্ণতার জ্বাজ্জল্যমান নিদর্শন ২৬-৩০
  মোহাম্মদ আবু কাওসার
- আগামী বিশ্বের আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নেযামে ওসিয়্যত ৩১-৩৫
  আলহাজ্জ এ. কে. রেজাউল করীম
- আহদীয়াত মুসলিম জামাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (২য় কিস্তি) ৩৬-৩৮
  মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্
- জামাতসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ ৩৯-৪১
- কবিতা ঃ বিশ্ব জুড়ে অবক্ষয় ও প্রতিকার ৪১
  জয়নাল আবেদীন

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের ২৭তম সালানা জলসা, ২০০৭-এ ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা মাহমুদ আহমদ, আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অস্ট্রেলিয়া জামাত।

ছবি ঃ কোরাইশী মোহাম্মদ মাসুদ

সূরা ইউনুস-১০

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এভাবেই অবাধ্যদের ক্ষেত্রে তোমার প্রভুপ্রতিপালকের সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়েছে। তারা কখনও ঈমান আনবে না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۭ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। তুমি বল, 'তোমাদের (কল্পিত) শরীকদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে সৃষ্টির সূচনাও করে আবার এর পুনরাবৃত্তিও করে? তুমি বল, (একমাত্র) আল্লাহ্‌ই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং এর পুনরাবৃত্তিও করেন।[১২৫৯] অতএব সত্য বিচ্যুত করে তোমাদের কোথায় নেয়া হচ্ছে?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ۭ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۭ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۡ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। তুমি বল, 'তোমাদের (কল্পিত) শরীকদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে?' তুমি বল, '(কেবল) আল্লাহ্‌ই সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন'। অতএব যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি বেশি অনুসরণযোগ্য, নাকি সে (বেশি অনুসরণযোগ্য) যাকে পথনির্দেশনা না দিলে সে পথ খুঁজে পায় না? অতএব তোমাদের হয়েছে কি? তোমরা কেমন বিচার কর?

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۭ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। আর তাদের অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। নিশ্চয় অনুমান কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না।[১২৬০] নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাল জানেন।

১২৫৯। স্রষ্টার প্রকৃত প্রমাণ হলো তাঁর পূর্ব-সৃষ্টিকে পুনরায় অবিকলরূপে সৃষ্টি করার শক্তি, নচেৎ এ দাবী অর্থাৎ সৃষ্টির দাবী সম্পূর্ণ ভূয়া প্রমাণিত হবে অথবা এতে মারাত্মক আপত্তি থেকে যাবে, অন্যথায় এরূপ দাবী মিথ্যাবাদী বা ভণ্ডও করতে পার। ঐশী সত্যতার এ প্রমাণ উপস্থাপন করে এ আয়াত প্রতিমা-পূজারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা রেখেছে, তাদের তথাকথিত দেব-দেবীগুলোর মাঝে কে এরূপ সৃষ্টি-পদ্ধতির এবং পুনঃসৃষ্টির হোতা, যে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে অবিরাম কাজ করে আসছে?

১২৬০। যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে তাদের বিশ্বস ও মতবাদ উদ্ভট অনুমান নির্ভর এবং কল্পনাপ্রসূত, কারণ তাদের তথাকথিত দেব-দেবী কখনও তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে নি।

হাদীস শরীফ

বিবাহ-শাদি

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাধারণতঃ কোন মহিলাকে চারটি কারণে অর্থাৎ তার ধন-দৌলত, বংশ-গৌরব, সৌন্দর্য এবং ধর্ম-পরায়ণতার জন্য বিবাহ করা হয়। কিন্তু ধর্ম-পরায়ণা মহিলাকে প্রাধান্য দাও, যাতে তোমাদের হাত ধূলায় ধূসরিত হয় অর্থাৎ তুমি বিনয়ী হতে পার।" (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল পাক (সা) বলেছেন, "ঐ তা'মে ওলীমাহ (বিবাহ-ভোজ) সবচাইতে নিকৃষ্ট যাতে শুধু মাত্র ধনীরাই আমন্ত্রিত হয় এবং দরিদ্রদেরকে বাদ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে"।
(মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সকল হালাল জিনিসের মধ্যে সব চেয়ে ঘৃণিত হালাল জিনিস হল তালাক।" (ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ, কিতাবুত্ তালাক)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সব চাইতে উত্তম যে তার পরিবারের জন্য উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।" (আবু দাউদ)

উত্তম আখলাক

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল পাক (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে তোমাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তি আমার সন্নিধানে প্রিয়তম ও নিকটতম হবে, যে চরিত্রের দিক হতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। তোমাদের মধ্যে তারাই আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং আমার অনেক দূরবর্তী হবে, যারা মন্দভাষী কঠোর স্বভাবের এবং মুতাফায়হেক'। তাঁরা বললেন, "আমরা মন্দভাষী, কঠোর স্বভাবের লোকদের সম্বন্ধে অবগত আছি কিন্তু 'মুফতায়হেক' কারা?" তিনি (সাঃ) বললেন, "তারা আত্মম্ভরী।' (তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াসসিলা)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "আমি আবির্ভূত হয়েছি যেন আমি আখলাককে পরিপূর্ণতা দান করি।" (আল্ সুনানুল কুব্‌রা)

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় সম্পর্কে

"কুরআন করীমের একাধিক স্থানে প্রচ্ছন্ন এবং অপ্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উলুহিয়্যত (ঈশ্বরত্ব)-এর পূর্ণতম প্রকাশস্থল, তাঁর আবির্ভাব খোদারই আবির্ভাব বটে।" (সুরমা চশ্‌মে আরিয়া)

"অতএব, যেহেতু আদিকাল হতে, এবং জগতের সৃষ্টি অব্দি খোদা তাআলাকে সনাক্ত করার বিষয় নবীকে সনাক্ত করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু নবীর মাধ্যম ব্যতীত তৌহীদকে (একত্ববাদকে) লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নবী, খোদা তাআলার চেহারা দেখার আয়না বা দর্পনস্বরূপ। এই দর্পণেই খোদার চেহারা অবলোকন করা যায়। যখন খোদা তাআলা নিজেকে প্রকাশিত করতে চান তখন তিনি কুদরত ও শক্তিনিচয়ের বিকাশস্থল হিসেবে নবীকে জগতে প্রেরণ করেন এবং স্বীয় ঐশীবাণী তাঁর প্রতি নাযেল করেন। তখনই জগত জানতে পারে যে, খোদা (সত্যসত্যই) বিদ্যমান আছেন। সুতরাং যে সকল মহাপুরুষের অস্তিত্ব জরুরী ভিত্তিতে খোদা তাআলার অনাদি ও চিরন্তন বিধান অনুযায়ী খোদার পরিচয় লাভের মাধ্যমে ও উপায় হিসেবে নিরূপিত, সে সব মহাপুরুষের প্রতি ঈমান আনয়ন তৌহীদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ, এবং এই ঈমান ব্যতিরেকে তৌহীদ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কেননা সেই সকল ঐশী-নিদর্শন এবং খোদার কুদরত ও মহিমা প্রদর্শনকারী বিস্ময়কর অলৌকিক ক্রিয়া ও ঘটনাসমূহ ব্যতিরেকে, যেগুলি নবীগণ দেখিয়ে থাকেন এবং মানুষকে তদ্বারা মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত করেন–সেই খাঁটি তৌহীদ যা পূর্ণ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের উৎস থেকে উৎসারিত হয়–সে–প্রকৃত তৌহীদ হস্তগত হতে পারে না। কেবল তাঁরাই সে জাতি, যাঁরা খোদাকে প্রদর্শনকারী, যাঁদের মাধ্যমে সেই খোদা যাঁর সত্তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং অতীব প্রচ্ছন্ন ও অজ্ঞেয় সে খোদা প্রকাশিত হন। চিরকাল ধরেই সেই গুপ্ত ভাণ্ডার যাঁর নাম খোদা-তিনি নবীগণের দ্বারাই উম্মোচিত ও পরিচিত হয়ে আসছেন। অন্যথায়, সেই তৌহীদ, যা এক ব্যবহারিক ও বাস্তবরূপ ও রং ধারণ করে থাকে তা লাভ করা নবীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে যেমন অযৌক্তিক, তেমনি খোদা প্রাপ্তির পথে পদচারীগণের অভিজ্ঞতারও পরিপন্থী।"

(হাকীকাতুল ওহী ঃ পৃঃ-১১২, ১১৩)

বিভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহ্ তাআলার 'সিফতে রাব্ব' এর উপর জ্ঞানগর্ভ আলোকপাত

''বর্তমান যুগে যেখানে প্রত্যেকেই বহু প্রভূ বানিয়ে রেখেছে, প্রত্যেক আহমদীর উচিত অন্তরে সদা রাব্বুনাল্লাহা-র পুনরাবৃত্তি করা।''

''মুসলমানরা স্বয়ং যুগ ইমামকে অস্বীকার করে খোদার প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।''

''একজন মু'মেনের উচিত যেন সে সেই সত্তার প্রতি মনোনিবেশ করে যাঁর পুরষ্কার ও অনুগ্রহের কোন তুলনা নেই। আল্লাহ্ তাআলার এরূপ ব্যবহারের কারণে তাঁর এমন ইবাদতকারী হোন আর এভাবে তাঁর ইবাদত করুন যা আত্মিক প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয় এবং যাতে একটি আকর্ষণ থাকে।''

সায়্যেদেনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:)। বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদ লণ্ডন। ২৪শে নভেম্বর, ২০০৬/২৪শে নবুয়ত ১৩৮৫ হিজরী শামসি

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর্ রহ্মানির রাহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস্সিরা তাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন্আমতা আলাইহীম গাইরিল মাগযুবে আলাইহীম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন।

গত খুতবায় আমি আল্লাহতা'লার 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্যের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং শেষদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করেছিলাম। আজও এ বিষয়টি জারী রাখবো। এ উদ্ধৃতিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) 'রাব্বুল আলামীন' বৈশিষ্ট্যের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা সেই সত্তা যাঁর মাঝে সকল গুনাবলীর সমাহার ঘটেছে। যা আমরা জানি তা আর যা জানি না তা-ও। এই সব বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষতার চরম মার্গে উপনীত। তিনি সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত আর সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত যা তাঁর গুনাবলী দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ আকর্ষণ ও উৎকৃষ্টতার এমন উন্নত শিখরে অধিষ্ঠিত যা মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না। বান্দার উপর সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালকের যে সকল পুরষ্কার আর অনুগ্রহ রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তাআলার দান, বান্দার কোন যোগ্যতা বা দক্ষতায় নয়। এটি এরূপ এক অনুগ্রহ যার মোকাবিলা দূরে থাক আয়ত্তও করা যায় না।

তিনি (আ:) বলেন, অনুগ্রহের এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তাআলা 'রাব্বুল আলামীন' এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার পুরো সৃষ্টি যা এই জগতে রয়েছে, তা আমরা জানি বা না জানি, বিজ্ঞানীরা তা সম্বন্ধে অবহিত হোক বা না হোক তারা সবাই এই 'রুবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্য দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। যদি মানুষ নিজের দিকে তাকায় তাহলে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ্ তাআলার অগনিত অনুগ্রহ দেখতে পাবে। বহু ঘটনা এমন ঘটে যার ফলশ্রুতিতে মানুষের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, শুধু আল্লাহ্ তাআলার 'প্রতিপালন' এবং 'অনুগ্রহের' ফলে সেই ঘটনার কুফল থেকে সে নিরাপদ রয়েছে। *অনেকেই দূর্ঘটনার শিকার হন; তারা লিখেন যে, ভয়াবহ দূর্ঘটনা ঘটেছে। আর গাড়ীর অবস্থা এমন হয়েছে যারা দেখেছেন তারা বলেছেন, এ অবস্থায় গাড়ীর মধ্যে বসা আরোহী কিভাবে বাঁচলো! সামান্য*

আঁচড়ও লাগেনি এবং অক্ষত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকের সাথেই এ ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। আমার সাথেও ঘানা-য় এ ধরণের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যা দেখে আল্লাহ্ তাআলার 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্যের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। অনেক সময় সেখানকার অবস্থা এত খারাপ হয়ে যেতো যে, অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যেতো না, কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের এবং বাচ্চাদের জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন, প্রতিপালন করেছেন, অনেক বার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিরাপদ রেখেছেন। এছাড়াও জীবনে অনেক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় আর সবার সাথেই এরূপ হয়ে থাকে। যদি প্রত্যেকে নিজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে সে দেখবে যে, আল্লাহ্ তাআলার 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্যই তাকে অনেক কিছু থেকে নিরাপদ রাখে, রক্ষা করে, তার প্রতিপালন করে আর তাঁর অনুগ্রহের ছায়ায় মানুষ লালিত-পালিত হচ্ছে।

'রাব্বুল আলামীন' কেবল সমস্যা থেকেই মুক্তি দেয় না বরং অনুকম্পা হলো, এর পাশাপাশি পুরস্কারের বারীও বর্ষিত হয়। কেবল দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার অনুগ্রহই নয় বরং পুরস্কার প্রদানের অনুগ্রহও রয়েছে। যদি হৃদয় মরে না গিয়ে থাকে আর চেতনা লোপ না পেয়ে থাকে তাহলে মানুষ কখনই আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজি ও 'রুবুবিয়্যত' গণনা করে শেষ করতে পারবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, স্বীয় বান্দার সাথে আল্লাহ্ তাআলার এই মহান অনুগ্রহের যে ব্যবহার তা এ বিষয়ের দাবী করে এবং একজন মু'মেনের এদিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন যে, সে যেন ঐ সত্তার প্রতি আকৃষ্ট ও মনোযোগী হয় যাঁর অনুগ্রহরাজির কোন তুলনা নেই। আল্লাহ্ তাআলার এধরণের ব্যবহারের ফলে তাঁর এরূপ ইবাদতকারী হোন আর এমন ইবাদত করুন যা আন্তরিক আবেগের সাথে হয় এবং এমন ইবাদত হওয়া উচিৎ যাতে অনুরাগ থাকে। কেবল শূন্যস্থান পূর্ণ করার মত ইবাদত যেন না হয়। সুতরাং একজন মু'মেনের পক্ষ থেকে এটি হলো আল্লাহ্ তাআলার প্রতি তাঁকে প্রতিপালনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ।

এ বিষয়ের বিভিন্ন আঙ্গিক আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার 'রুবুবিয়্যত' বৈশিষ্ট্য কোন্ কোন্ জায়গায় কিভাবে কাজ করছে অগনিত স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। বা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাকে কিভাবে দান করেন হাদীস থেকে তা আমরা জানতে পারি। তারপর এযুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন যে, এই বৈশিষ্ট্যের অধীনে আল্লাহ্ তাআলা কত অনুগ্রহ আর পুরষ্কারে ভূষিত করছেন।

পুরানো তফসীরকারকদের মধ্যে আল্লামা রাজির তফসীরও উন্নত মানের। তিনি এ বিষয়ের যে তফসীর করেছেন তাতে আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদ (ওয়াহদানীয়্যত) প্রমাণ করার পরে তিনি লিখেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক, কারণ কোন বস্তু যতক্ষণ বহাল আর স্থায়ী থাকে, তিনিই স্থায়িত্ব দান করেন। অর্থাৎ, তিনিই প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তিনিই নির্ভরস্থল, সঠিক পথে পরিচালিত করেন, কোন জিনিষের জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তিনি তা সরবরাহ করেন। তিনি আরো লিখেন, 'মুরাব্বী' অর্থাৎ, লালন ও প্রতিপালনকারী দু'ধরণের হয়ে থাকে। প্রথম হচ্ছে প্রতিপালনকারী! এই উদ্দেশ্যে পরিচর্যা ও প্রতিপালন করেন যেন নিজে এথেকে লাভবান হতে পারেন। অর্থাৎ, লালন-পালনকারী স্বয়ং তার দ্বারা উপকৃত হয় যাকে সে লালন-পালন করছে। দ্বিতীয়ত: সে এই উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করে যেন সেই ব্যক্তি যাকে লালন-পালন করছে সে লাভবান হতে পারে (ব্যক্তিগত লাভ নয় বরং অন্যের কল্যাণের জন্য)। তাই বলা হয়েছে, সৃষ্টির মধ্যে সবার লালন-পালন প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যদি মানুষ কাউকে লালন-পালন করে তাহলে এজন্য করছে যেন সে তাথেকে লাভবান হতে পারে। কেননা সে অন্যের প্রতিপালন এ উদ্দেশ্যে করে যেন তার কাছ থেকে সে স্বয়ং লাভবান হতে পারে। সেই লাভ প্রতিদানের আকারে হোক বা গুনগানের মাধ্যমেই হোক। অর্থাৎ, তার মাধ্যমে বাহ্যিক এবং জাগতিক উপকার হোক বা এজন্য কাউকে নিযুক্ত করুক। অনেকেই মানুষ নিযুক্ত করে রাখে, প্রশংসা বা তোষামোদের খাতিরে সাঙ্গ-পাঙ্গ ও বন্ধু-বান্ধব জড়ো করে রাখে। যদিও দ্বিতীয় প্রকারের 'মুরাব্বী' কেবল আল্লাহ্ সুবহানাল্লাহু তাআলা; তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের এজন্য সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা আমার থেকে উপকৃত হতে পারো, এই উদ্দেশ্যে নয় যে আমি তোমাদের দ্বারা উপকৃত হবো'। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা অন্যান্য সকল প্রতিপালনকারী এবং অনুগ্রহকারীর বিপরীতে প্রতিপালন ও অনুগ্রহ করেন।

এরপরে তিনি লিখেছেন, আল্লাহ্ তাআলা এবং অন্যের (গায়রুল্লাহ্) লালন-পালন বিভিন্ন দিক থেকে পৃথক হয়ে থাকে। একটি ভিন্নতার কথা আমি পূর্বে পাঠ করেছি।

দ্বিতীয় ভিন্নতা হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ যখন কারো লালন-পালন করেন, এতে যতটুকু তার প্রতিপালন করা হয় তার ভাণ্ডারে ততটুকু ঘাটতিরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ক্ষতি এবং ঘাটতি জনিত দূর্বলতার উর্ধ্বে। যেভাবে তিনি বলেছেন, *'ওয়া ইম মিন*

শাইঈন ইল্লা ইনদানা খাযায়েনুহা ওয়ামা নুনাযযিলুহা ইল্লা বি কাদারিম মা'লুম' (সূরা আল্ হিজর:২২)

এরপরে তৃতীয় বিষয় তিনি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্যান্য যত অনুগ্রহশীল রয়েছে তাদের সামনে যখন কোন অভাবী নিজ প্রয়োজন মরিয়া হয়ে পেশ করে তখন সে অসন্তুষ্ট হয় এবং সেই দরিদ্র নাছোড়বান্দাকে নিজ দান থেকে বঞ্চিত করে। অথচ আল্লাহ্ তাআলার ব্যবহার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেভাবে হাদীসে এসেছে ***'ইন্নাল্লাহাতা'লা ইউহিব্বুল মুলাহ্হীনা ফীদ্ দুয়ায়ে' অর্থাৎ,*** আল্লাহ্ তাআলা তাদের ভালবাসেন যারা দোয়াতে কাকুতি-মিনতি এবং পুনরাবৃত্তি করে।

চতুর্থ পার্থক্য হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য অনুকম্পাশীল এমন যে, যতক্ষন পর্যন্ত তাদের কাছে না চাওয়া হয় তারা দান করে না অথচ আল্লাহ্ তাআলা কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার পূর্বেই তাকে দান করে থাকেন। অতএব দেখুন! যখন আপনি মায়ের পেটে ভ্রুন ছিলেন তখনও আল্লাহ্ তাআলা আপনার প্রতিপালন করেছেন আর সে সময়ও যখন আপনি অবোধ ছিলেন এবং চাওয়ার ক্ষমতাই ছিলো না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সেই সময়ও আপনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনুগ্রহ করেছেন যখন আপনি বুদ্ধি এবং হেদায়াত শুন্য ছিলেন।

পঞ্চম পার্থক্য হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অনুগ্রহশীলের অনুগ্রহ অসচ্ছলতা; অনুপস্থিতি অথবা মৃত্যুর কারণে বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, উপকারীর অবস্থা যদি খারাপ হয়ে যায় অথবা পূর্ববৎ না থাকে বা মারা যায় তাহলে অনুগ্রহ বন্ধ হয়ে যায় অথচ আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহের ধারা কোন অবস্থাতেই কর্তিত হয় না।

এরপরে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যান্য অনুগ্রহকারীর কৃপা অনেক জাতিকে বঞ্চিত রেখে কেবল কোন একটি জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, এজন্য মোটের উপর পুরো জগতকে নিজ দানে ভূষিত করা সম্ভবই নয় অথচ আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও প্রতিপালনের কল্যাণ প্রত্যেকের কাছে পৌঁছুচ্ছে। যেভাবে বলা হয়েছে, ***'রাহমাতী ওয়াসিয়াত কুল্লা শাইঈন' (সূরা আল্ আরাফ: ১৫৭)।*** অর্থাৎ, আমার রহমত প্রতেক বস্তুর উপর ছেয়ে আছে।

এই সকল বিষয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তাআলাই 'রাব্বুল আলামীন' এবং পুরো সৃষ্ট জগতকে নিজ অনুগ্রহের কল্যাণে ভূষিত করছেন। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা নিজ সম্পর্কে ***'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'*** বলেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা যেখানে তাঁর বান্দাদের দৈহিকভাবে উপকার করছেন সেখানে আধ্যাত্মিক কল্যাণও পৌঁছিয়ে থাকেন। কেবল এটিই নয় যে, দৈহিকভাবেই উপকার করছেন বরং বিভিন্ন জাতিতে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা সংস্কারক এবং নবী প্রেরণ করেন যেন পাশাপাশি মানুষের তরবীয়তও (ধর্মীয় প্রশিক্ষণ) হতে থাকে।

তারপরে তিনি (আঃ) লিখেন 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্য লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ (তরবীয়ত) এর প্রতি ইঙ্গিত করে। শেষ সূরা সমূহে আল্লাহ্ তাআলা 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ভবিষ্যতে আগত মানুষের জন্যও প্রতিপালনের মাধ্যম বানিয়েছেন ঠিক সেভাবে যেভাবে তিনি ইতোপূর্বে মানুষের প্রতিপালন করে আসছেন। যেমন বান্দাদের ভাষায় বলা হয়েছে 'হে আমার আল্লাহ্! প্রতিপালন ও অনুগ্রহ তোমার কাজ তাই তুমি আমাকে উপেক্ষা করোনা আর আমার আশা-প্রত্যাশাকে বিফল করো না'।

সূরাতুল্ ফালাক এবং সূরাতুন্ নাস সম্পর্কে বলছেন যে, এতে 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, পবিত্র আল্লাহ্ সেই সত্তা যাঁর প্রতিপালন এবং অনুগ্রহ,'হে বান্দা! তোমার থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না'। সুতরাং এটি একথার প্রতিও ইঙ্গীত যে, ভবিষ্যতেও নবুয়তের পথ খোলা রয়েছে, সংস্কারকের পথ উম্মুক্ত যা আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দাদের তরবীয়তের জন্য আবির্ভূত করেন, যাকে অন্যান্য মুসলমান গ্রহণ করে না। সুতরাং 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্যের উপর যদি বিশ্বাস ও ঈমান থাকে তাহলে এর প্রতিও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যতেও নবী প্রেরণ করতে পারেন যদিও আমাদের অন্যান্য বন্ধুরা বলেন যে, নবী প্রেরণ করবেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, *''খোদা তাআলা সমগ্র বিশ্বের খোদা। যেভাবে তিনি সকল সৃষ্টির বাহ্যিক ও দৈহিক প্রয়োজন ও প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও উপকরণ কোন বৈষম্য ছাড়াই সবার জন্য সমভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর আমাদের নীতি অনুসারে তিনি প্রভূ-প্রতিপালক; তিনি খাদ্য শস্য, বায়ু, পানি, আলো ইত্যাদী উপকরণ সকল সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন, অনুরূপভাবে তিনি প্রত্যেক যুগে সকল জাতির সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সংস্কারক প্রেরণ করেছেন। যেভাবে আল্লামা রাজী-ও লিখেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা দেখেন যে বিশ্ব ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, অবস্থা শোচনীয় হচ্ছে তখন আবেদনকারীর চাওয়ার পূর্বেই সংস্কারক প্রেরণ করেন।''*

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, *''যে জাতি বা ধর্মের এই ধারণা যে, আল্লাহ্ তাআলা কেবল তাদেরকেই বিশেষত্ব দিয়েছেন, (সে সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) এতে আর্য সমাজী, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের কথা উল্লেখ করেছেন) তাদের ধারণা হচ্ছে কেবল তাদের মাঝেই সংস্কারক আসতে পারেন,*

তাদের মধ্যেই পূণ্যবান মানুষ জন্ম নিতে পারেন, তাদের মাঝেই নবী আবির্ভূত হতে পারেন, ইস্রাইলীদের বাহিরে কোন নবী আসতে পারেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, এর অর্থ হলো তারা আল্লাহ্ তাআলা কে সমগ্র বিশ্বের প্রভূ-প্রতিপালক মনে করে না, কিন্তু ইসলামের খোদা 'রাব্বুল আলামীন' বা সমগ্র বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক, এজন্য পবিত্র কুরআনের সূচনাই হয়েছে এই শব্দ দ্বারা।''

তিনি (আঃ) বলেন, *''সুতরাং এ সকল বিশ্বাস রহিত কল্পে খোদা তাআলা এ আয়াত অর্থাৎ 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা কুরআন শরীফ আরম্ভ করেছেন এবং কুরআন শরীফের সর্বত্র তিনি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এ কথা সঠিক নয় যে, কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ দেশে খোদার নবী এসেছে, বরং খোদা কোন জাতি এবং কোন দেশকে ভুলেন নি আর পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন ধরণের দৃষ্টান্তের আলোকে বলা হয়েছে যে, যেভাবে খোদা প্রত্যেক দেশের বাসিন্দাদের জন্য তাদের অবস্থা অনুপাতে তাদের দৈহিক প্রতিপালন করেছেন অনুরূপভাবে তিনি প্রত্যেক দেশ এবং প্রতিটি জাতিকে আধ্যাত্মিক প্রতিপালনে কলাণমন্ডিত করেছেন, যেভাবে তিনি কুরআন শরীফে একস্থানে বলেছেন, 'ওয়া ইম মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফীহা নাযীর' (সূরা আল্ ফাতের:২৫) অর্থাৎ, এমন কোন জাতি নেই যাতে কোন নবী প্রেরণ করা হয়নি।''*

তিনি (আঃ) বলেন, *''তাই এটি কোন বিতর্ক ছাড়াই গ্রহণযোগ্য যে, তিনি সত্য ও কামেল খোদা যার উপর ঈমান আনয়ন প্রত্যেক মানবের জন্য আবশ্যক, তিনি 'রাব্বুল আলামীন' (সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক), আর তাঁর প্রতিপালন কোন বিশেষ জাতি, কোন বিশেষ যুগ এবং কোন বিশেষ দেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তিনি সকল জাতির প্রভু-প্রতিপালক, সকল যুগের 'রাব্ব' আর সকল স্থানের প্রভু। সব জায়গা আর সকল দেশের প্রভু। সকল দেশের তিনিই প্রভু আর সকল কল্যাণের তিনিই উৎসস্থল, প্রত্যেকের দৈহিক ও আত্মিক শক্তি তাঁর সত্তা থেকে উৎসারিত এবং সবাই তাঁর দ্বারাই প্রতিপালিত আর তিনিই প্রত্যেকের ভরসাস্থল।''*

''খোদার সার্বজনীন কল্যাণ যা সকল জাতি, দেশ এবং যুগকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এটি এজন্য হয়েছে যেন কোন জাতি এ আপত্তির সুযোগ না পায় যে, খোদা অমুক অমুক জাতির উপর অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু আমাদের উপর করেন নি। অথবা অমুক জাতি তাঁর কাছ থেকে সঠিক পথের দিশা লাভের জন্য কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু আমরা পাই নি। অথবা অমুক যুগে তিনি স্বীয় ওহী, ইলহাম ও অলৌকিক নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছেন কিন্তু আমাদের সময়ে লুক্কায়িত থেকেছেন। তাই তিনি সর্বব্যাপী কল্যাণ প্রদর্শন করে এ সকল আপত্তিকে প্রতিহত করেছেন আর স্বীয় এরূপ ব্যাপক বৈশিষ্ট প্রদর্শন করেছেন। কোন জাতিকে তাঁর দৈহিক ও আত্মিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি আর কোন যুগকে দুর্ভাগা সাব্যস্ত করেন নি।'' (পয়গামে সুলাহ, রুহানী খাযায়েন ২৩তম খন্ড, ৪৪১-৪৪২ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এ যুগে আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে মানার ফলে আমরা এই কল্যাণ লাভ করেছি। তাই আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। গত খুতবায়ও আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, পবিত্র কুরআনে অগনিত স্থানে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় এই 'রাব্ব' বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন আর মু'মেনদের বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করিয়েছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে, তোমাদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা তা দৈহিক হোক বা আত্মিক, আল্লাহ্ তাআলা বলেন "এ সব কিছু আমার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আমি তোমাদের 'রাব্ব' এজন্য সর্বদা আমার প্রতি ঝুঁকো.সমর্পিত হও এবং আমার কাছে চাও"।

তিনি বলেন, *'ক্বালা রাব্বুকুম উদ্উনী আস্তাজিবলাকুম। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্তাকবিরূনা আন্ ইবাদাতী সাইয়াদখুলুনা জাহান্নামা দাখিরন (সূরাতুল্ মু'মেন:৬১)* অর্থাৎ– এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব'। কিন্তু যারা নিজেদেরকে আমার ইবাদতের উর্ধে মনে করে তারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'সর্বদা স্মরণ রেখ! আমিই তোমাদের অভাব মোচনকারী। এখন পর্যন্ত যা কিছু তোমরা লাভ করেছ আর তোমরা যে জীবন অতিবাহিত করেছ তা আমার অনুগ্রহের ফলে, আমার বিভিন্ন দানের সুবাদে'। এজন্য সর্বদা স্মরণ রেখো যে, অন্য কারো সম্মুখে ঝুঁকবে না বরং সর্বদা মনের মণিকোঠায় একথা সযত্নে রাখতে হবে যে, এগুলো আল্লাহ্ তাআলার বিভিন্ন নেয়ামত আর অনুগ্রহ যিনি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা বলেন 'সর্বদা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের দোয়া শ্রবণকারী, তোমাদের চাহিদা আমার সমীপে উপস্থাপন করো আমি তা পুরো করবো'। যদি আমার ইবাদত না করো তাহলে প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ্ তাআলা যে সকল জাগতিক চাহিদা পূর্ণ করছেন তা পূর্ণ করতে থাকবেন কিন্তু কিয়ামত দিবসে এমন

লোকদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। তাই সর্বদা ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে।

তারপরে বলেন, *'আল্লাহুল্লাযী জাআলা লাকুমুল্ লাইলা লিতাস্কুনু ফী'হে ওয়ান্ নাহারা মুবছিরান ইন্নাল্লাহা লাযু ফাযলিন আলান্নাসি ওয়ালাকিন্না আক্সারান্নাসি লা ইয়াশকুরুন' (সূরাতুল মু'মেন:৬২)* অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ্! যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা এতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিবসকে দেখার জন্য (আলোকোজ্জ্বল) করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

পূর্বের আয়াতের পরে এ আয়াত এসেছে। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। স্বীয় প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যের অধীনে আমাদের আরামের জন্য কত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। এ সব কিছুর দাবী হলো; তার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হওয়া। বলা হয়েছে রাত ও দিন সৃষ্টি করে তোমাদের কাজ ও বিশ্রামকে সহজ সাধ্য করেছেন, সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেখানে কাজ ও বিশ্রামের জন্য তোমাদের প্রকৃতিতে বিভিন্ন উপাদান সৃষ্টি করেছেন সেখানে সেই অবস্থাও সৃষ্টি করেছেন যদ্দারা তোমরা বেশি বেশি লাভবান হতে পারো। এ নিয়ে চিন্তা করো আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও।

আবার বলেছেন *'যালিকুমুল্লাহু রাব্বুকুম খালিকু কুল্লি শাইয়্যিন লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ফাআন্না তু'ফাকুন' (সূরাতুল মু'মেন:৬৩)* অর্থাৎ, এই তো আল্লাহ্! যিনি তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তোমরা বিপথে কোথায় যাচ্ছ।

পুনরায় তিনিই বলছেন, এত অনুগ্রহরাজি যা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। তাই স্মরণ রেখ! কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে, তাঁর সমীপে সমর্পিত হয়ে তাঁর ইবাদত করতে হবে। তাঁর কাছে চাওয়ার জন্য অন্য কোন প্রভুর সন্ধান করো না। শয়তানের প্ররোচনায় পরে নিজ প্রভুর নির্দেশাবলীর অবাধ্য হয়ো না। সর্বদা স্মরণ রেখ! তিনিই একক মা'বুদ! যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তা-নাহলে যদি তোমরা অন্য কাউকে মা'বুদ মনে করো তাহলে হাবুডুবু খাবে।

এরপরে বলেন, *'কাযালিকা ইউ'ফাকুল্লাযীনা কানু বিআয়াতিল্লাহী ইয়াজহাদুন' (সূরাতুল মু'মেন:৬৪)* অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে হঠকারিতা পূর্বক পরিত্যাগ করে তারা বিপথে পরিচালিত হয়।

তারপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, *'আল্লাহুল্লাযী জা'আলা লাকুমুল আরযা ক্বারারাওঁ ওয়াস্সামায়া বিনাআওঁ ওয়া সাওয়্যারাকুম ফাআহ্সানা ছু'রাকুম ওয়া রাযাক্বাকুম মিনাত্তাইয়্যেবাতি যালিকু-মুল্লাহু রাব্বুকুম ফাতাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামীন' (সূরাতুল মু'মেন:৬৫)* অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ্! যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য আবাসস্থল স্বরূপ এবং আকাশকে তোমাদের নির্ভরতার জন্য ছাদস্বরূপ; এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন আর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রিয্ক প্রদান করেছেন। এইতো আল্লাহ্! তোমাদের প্রতিপালক; অতএব পরম কল্যাণের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।

সুতরাং কারো প্ররোচনায় পতিত হবার পরিবর্তে সেই খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ো যিনি তোমাদের জন্মের পূর্বেই তোমাদের জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ও আকাশের অগনিত সৃষ্টিকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন। তোমাদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতি প্রদান করেছেন, তোমাদেরকে রিয্ক প্রদান করেছেন। এ সবকিছু তোমাদের মনোযোগ সে দিকে আকৃষ্ট করছে যে, তোমাদের একজন প্রভু রয়েছে, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, যদি তাঁর সমীপে অনুগত থাকো তাহলে পুরস্কার আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হলে আরো বৃদ্ধি হবে, তোমাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদী পূর্ণ হতে থাকবে।

আবার বলেন, *'হুওয়াল হাইয়্যু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া ফাদ্উহু মুখলিছিনা লাহুদ্দীন-আল্হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরাতুল মু'মেন:৬৬)* অর্থাৎ, তিনি চিরঞ্জীব এবং জীবন-দাতা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা আনুগত্যকে তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে তাঁকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।

একই সূরার এই আয়াত সমূহ ধারাবাহিক ভাবে আসছে এবং একাধারে এ সকল আয়াত এ দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করছে। পুনরায় এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছেন এবং বলছেন যে, এই দৈহিক ও আত্মিক পুরস্কারসমূহকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখ আর নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করো কেননা, তিনিই চিরঞ্জীব খোদা, অন্য সব কিছু লয়শীল । তাই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সামগ্রীর পিছনে ধাবিত না হয়ে বরং জীবন্ত খোদার সাথে সম্পর্ক তৈরী কর যিনি পুরো সৃষ্টি জগতের প্রভু কেননা, তার মাঝেই তোমাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবন নিহিত।

আল্লাহ্ তাআলা বারংবার আমাদেরকে বিভিন্ন পুরষ্কার আর অনুগ্রহের উল্লেখ করে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন যে, তাঁর ইবাদত করো আর তাঁকেই সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক মনে কর। এসব কিছু আমাদের কল্যাণের জন্য। তিনি

জানেন মানুষ সহজেই শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তাই বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। এই সব কিছু এজন্য যে, আমাদের প্রভু! যিনি পরম স্নেহশীল তিনি আমাদেরকে উত্তম পরিণতির পথ প্রদর্শন করছেন যে, এগুলো সেই পথ যাতে পরিচালিত হয়ে আমরা আমাদের পরিণতি শুভ করতে পারি নতুবা শয়তানতো পথে দাঁড়িয়েই আছে। আল্লাহ্ তাআলা যিনি আমাদের প্রতিপালক-প্রভু আমাদের কোন কিছুরই তাঁর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার পূণ্য কাজে অবশ্যই আনন্দিত হন কিন্তু এটি এজন্য নয় যে, বান্দার প্রশংসার বা ইবাদতের তাঁর কোন প্রয়োজন আছে। তিনি এজন্য আনন্দিত হন যে, তাঁর বান্দা পূণ্যের পথে পরিচালিত হচ্ছে। জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাচ্ছে। তাঁর নেক বান্দা এবং যারা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করেন তাদের দেখে আল্লাহ্ তাআলা সেই মায়ের চেয়েও বেশী আনন্দিত হন, যে মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হন।

সৎকর্ম সম্পাদন করলে আমাদের প্রভু কিভাবে দান করেন একটি হাদিসে তার উল্লেখ রয়েছে, *''হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা:) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন, যে পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ সদকাহ্ করে, আর পবিত্র বস্তুই আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে; তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন এবং তা বর্ধিত করতে থাকেন। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজ অশ্ব শাবককে প্রতিপালন করে।*

(বুখারী কিতাবুত্ তাওহীদ বাবুল কৃওলুল্লা হিতাআলা তা'রুজুল মালাইকাতি ওয়ার রূহু ইলাইহি ওয়া কৃওলুহু ইলাইহি ইউসইদুল কালামুত্ ত্বাইয়েবে)

ঘোড়ার বাচ্চার এক বয়সে এসে বৃদ্ধি থেমে যায়। হুযুর (সাঃ) বলেন, *''তোমরা যা সদকাহ্ করো তা এতটাই বর্ধিত করা হয় যে, তা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়''।*

এই হচ্ছে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহের মান। এরূপ প্রভুকে পরিত্যাগ করে বান্দা অন্য কোন দিকে যাওয়া পছন্দ করবে কি বা করতে পারে কি? না কখনই নয়। কিন্তু অজ্ঞাতে আমাদের দ্বারা অনেক এমন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় যা আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা বিরোধী হয়ে থাকে। তাঁর শিক্ষার পরিপন্থি, তাঁর নির্দেশাবলীর বিপরীত হয়ে থাকে। এজন্য সর্বদা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা উচিত আর ক্ষমা ভিক্ষার পথও আমাদের এই প্রভুই আমাদেরকে দেখিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন যেন এই পুরস্কার ও সম্মাণের ধারা সদা অব্যাহত থাকে। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলেন, সর্বদা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক, আমার কাছে স্বীয় পাপের মুক্তি কামনা করতে থাক যেন আমি তোমাদের উপর পুরস্কার আর অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করতে পারি।

সুতরাং বর্তমান যুগে প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে সর্বদা 'রাব্বুনাল্লাহ্'র পুনরাবৃত্তি করতে থাকা উচিত। অথচ প্রত্যেকে অনেক প্রভূ বানিয়ে রেখেছেন যা বাহ্যিক নয় লুক্কায়িত। শির্ক চরমে পৌঁছেছে। যুগ ইমামকে অস্বীকার করে মুসলমানরা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার 'প্রতিপালন' বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে আর করছে, যুগের সংশোধন কল্পে আল্লাহ্ তাআলা কোন নবী প্রেরণ করতে পারেন না যদিও এর প্রয়োজন রয়েছে। একদিকে প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করছে অন্যদিকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিপাল'ন এর বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করছে। আল্লাহ্ তাআলাতো বলেছেন, আমি এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে না চাইতেও দিয়ে থাকি আর অবস্থার উন্নতি করি। আর এখানে চাওয়া হচ্ছে তারপরও দিচ্ছেন না এজন্য যে, তারা স্বয়ং এই বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। যিনি এসেছেন তাঁকে মানতে প্রস্তুত নয়, এই ধারণাই নেই যে কোন নবী বা সংস্কারক আসতে পারেন আর এরা এর কুফলও ভোগ করছে। বিশেষভাবে মুসলমান দেশসমূহে অশান্ত পরিস্থিতি ও অস্থিরতার পরিবেশ সর্বত্র বিরাজমান। এই অবস্থায় শুধু একজন আহমদীই আছেন যিনি নিজ আল্লাহ্র প্রতিপালনের সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রাখেন আর থাকা উচিত। আমরাও যদি আমাদের কর্তব্য পালন না করি, নিজেদের ইবাদতকে জীবন্ত করে আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা না হই আর সেই পুরষ্কার ও অনুগ্রহের মূল্যায়ন না করি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর সত্তায় আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দান করেছেন এবং সেই শিক্ষানুযায়ী স্বয়ং নিজেকে না গড়ি যা তিনি আমাদের প্রদান করেছেন আর যা তিনি আমাদের উপর প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন, আমাদের কাছে তিনি যার প্রত্যাশা রাখতেন তাহলে আমাদের এই যে দাবী যে, আমরা স্বীয় প্রভুকে চিনেছি এবং আমরা তাঁর ইবাদতকারী, তা কেবল মাত্র অন্তঃসারশুন্য দাবী হবে। আল্লাহ্ তাআলা কেবল দাবীর কারণে অতিরিক্ত পুরষ্কার প্রদান করেন না, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন পুরো নিষ্ঠার সাথে আমার সমীপে ঝুঁকো।

আল্লাহ্ করুন যেন আমরা প্রকৃতপক্ষেই নিজ প্রভুকে চিনতে পারি, যেন অন্যদেরকেও এই সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করতে পারি আর যেন বেশি বেশি এক খোদার ইবাদতকারী সৃষ্টি হয় যাতে বিশ্বে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

(হুযূর আনোয়ার (আই:)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক মহান নাম সমূহ

১। আল্লাহ্–ইসমে আযম বা মহানাম।
২। রাব্ব–প্রভু।
৩। আর রাহমান–অযাচিত দানকারী
৪। আর রাহীম–কর্মের প্রতিদানে বার বার অনুগ্রহকারী।
৫। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন–বিচার সময় ও দিবসের প্রভু।
৬। আল মালিক–সম্রাট।
৭। আল-কুদ্দুস–পবিত্র।
৮। আস-সালাম–পবিত্র।
৯। আল-মুমিন–নিরাপত্তাদাতা।
১০। আল-মুহায়মিন–রক্ষাকর্তা।
১১। আল-আযীয–পরাক্রমশালী।
১২। আল-জাব্বার–সংস্কার কর্তা।
১৩। আল-মুতাকাব্বের–মহা গৌরবময়।
১৪। আল-খালিক–স্রষ্টা।
১৫। আল-বারী –প্রত্যেক বস্তুর আদি স্রষ্টা।
১৬। আল-মুসাব্বির–আকৃতি দাতা।
১৭। আল-গাফফার–মহা ক্ষমাশীল।
১৮। আল-কাহ্হার–সর্বপ্রধান।
১৯। আল-ওয়াহ্হাব–মহাদাতা।
২০। আর-রায্যাক–জীবিকাদাতা।
২১। আল-ফাত্তাহ–উন্মুক্তকারী।
২২। আল-আলীম-পরম জ্ঞানময়।
২৩। আল-কাবিদ–নিয়ন্ত্রণকারী।
২৪। আল-বাসিত–প্রসার দাতা।
২৫। আল-খাফিস–অবনতকারী।
২৬। আর-রাফী–উত্তলনকারী।
২৭। আল-মুইয্যো–সম্মানদাতা।
২৮। আল-মুযিল্লু–অবনমিতকারী।
২৯। আস-সামী–সর্ব শ্রোতা।
৩০। আল-বাসীর–সর্বদ্রষ্টা।
৩১। আল-হাকাম–পরম মীমাংসাকারী।
৩২। আল-আদল–ন্যায় বিচারক।
৩৩। আল-লাতীফ–যিনি স্বয়ং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ অবগত, অত্যন্ত দয়াশীল।
৩৪। আল-খাবীর–সর্বজ্ঞ।
৩৫। আল-হালীম– পরম সহিষ্ণু।
৩৬। আল–আযীম–মহান।
৩৭। আল-গাফুর–অত্যন্ত ক্ষমাকারী।
৩৮। আশ-শাকুর–মহা মর্যাদাদাতা।
৩৯। আল-আলী–অতি উচ্চ।
৪০। আল-কাবীর–তুলানাবিহিনরূপে মহান।
৪১। আল-হাফীয–হেফাযতকারী।
৪২। আল-মুকীত–সংরক্ষণকারী। সৃষ্ট বস্তুর বৃত্তি নিচয়ের সংরক্ষণকারী।
৪৩। আল-হাসীব–হিসাব নিকাশকারী।
৪৪। আল-জালীল–মহামহিমার অধিপতি।
৪৫। আল-কারীম–মহানুভব।
৪৬। আর-রাকীব–পরিদর্শনশীল।
৪৭। আল-মুজিব–প্রার্থনা মঞ্জুরকারী।
৪৮। আল-ওসী'–সর্ব পরিবেষ্টনকারী, বদান্যশীল।
৪৯। আল-হাকীম–প্রজ্ঞাময়।
৫০। আল-ওয়াদুদ–প্রেমময়।
৫১। আল-মাজিদ–সম্মানের অধিপতি।
৫২। আল-বায়েস–পুনরুত্থানকারী।
৫৩। আশ-শাহীদ–সাক্ষী।
৫৪। আল-হাক্ব–সত্য।
৫৫। আল-ওয়াকিল–অভিভাবক।
৫৬। আল-কাওয়ী–শক্তিশালী।
৫৭। আল-মাতিন–প্রবল।
৫৮। আল-ওয়ালি–পরম বন্ধু।
৫৯। আল-হামীদ–প্রশংসা ভাজন।
৬০। আল-মুহ্সী–লিখক।
৬১। আল্-মুব্দী–সূচনাকারী।
৬২। আল-মুয়ীদ–পুনঃকারক।
৬৩। আল-মুহ্য়ী–জীবনদাতা।
৬৪। আল-মুমীত–মৃত্যুদাতা।
৬৫। আল-হাঈ–জীবনময়।
৬৬। আল-কাইউম–সকলের স্থিতি দাতা।
৬৭। আল-ওয়াজেদ–আবিষ্কারক।
৬৮। আল-কাদীর–শক্তি ও ক্ষমতার অধিকরী।
৬৯। আল-মুক্তাদীর–সর্বশক্তিমান।
৭০। আল-মুকদ্দিম–উন্নতির উপায় ও উপকরণের ব্যবস্থাপক।
৭১। আল-মুয়াখ্খের–বিলম্বকারী, অপদস্তকারী।
৭২। আল-আওয়াল–প্রথম।
৭৩। আল-আখির–শেষ।
৭৪। আয-যাহির–প্রকাশিত।
৭৫। আল-বাতিন–গুপ্ত।
৭৬। আল-ওয়ালী–শাসনকর্তা।
৭৭। আল-মুতা'আলী–সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিপতি।
৭৮। আল্-বার্–দয়ালু।
৭৯। আত-তাওওয়াব–অনুতাপ গ্রহণকারী।
৮০। আল-মুনইম–অনুগ্রহ বিতরণকারী।
৮১। আল-মুস্তাকীম–প্রতিফলদাতা।
৮২। আল-আফউ–পাপ মোচনকারী।
৮৩। আর-রাউফ–করুণাশীল।
৮৪। মালিকুল-মুলক–রাজাধিপতি।
৮৫। আল-মুকসিত–ন্যায়পরায়ণ।
৮৬। আল-জামী–একত্রকারী।
৮৭। আল-গানী–স্বয়ং সম্পূর্ণ।
৮৮। আল-মুগনী–প্রাচুর্য প্রদানকারী, ধনী কারক।
৮৯। আল-মানে'–প্রতিরোধকারী।
৯০। আদ্-দার–শান্তিদাতা।
৯১। আন-নাফে'–উপকার সাধনকারী।
৯২। আন-নূর–আলো।
৯৩। আল-হাদী–পথ প্রদর্শক।
৯৪। আল-বাদী–পত্তনকারী।
৯৫। আল-বাকী–যিনি সকলকে অতিক্রম করে থাকেন।
৯৬। আল-ওয়ারেস–উত্তরাধিকারী।
৯৭। আর রাশীদ–সত্যপথ নির্দেশকারী।
৯৮। আস-সাবুর–ধৈর্যশীল।
৯৯। যুল-আরশ–সিংহাসনের অধিপতি।
১০০। যুল-ওয়াকার–ধৈর্য এবং গাম্ভীর্যের অধিপতি।
১০১। আল-মুতাকাল্লীম–বাঙময়।
১০২। আশ-শাফী–আরোগ্য প্রদানকারী।
১০৩। আল-কাফী–যিনি যথেষ্ট।
১০৪। আল-আহাদ–অনুপম।
১০৫। আল-ওয়াহীদ–অদ্বিতীয়।
১০৬। আস-সামাদ–স্বয়ম্ভু। যাঁহার উপরে সকলে নির্ভরশীল।
১০৭। যুল যালালে ওয়াল ইকরাম–মহিমা ও বদান্যতার অধিপতি।

[আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব পুস্তক থেকে সংগৃহীত]

মানবতার আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)

কোন ব্যক্তির মানবতার আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে সেই ব্যক্তি তার নিজের জায়গায় কতটুকু আদর্শবান ছিলেন? নিজের অবস্থানে নিজে যদি আদর্শ না হন তবে কিভাবে তিনি মানবতার জন্য আদর্শ হবেন?

তিনি (সাঃ) তো অল্প বয়সেই মক্কাবাসী লোকদের কাছ থেকে আল-আমীনের খেতাব পেয়েছিলেন। বাল্যকালে আমানতদার এবং সত্যবাদী হওয়াটাই তার আদর্শের উপরে বিশেষভাবে আলোপকাত করার জন্য যথেষ্ট নয়? কিন্তু কোন ব্যক্তি জাতিসুদ্ধ লোকের পক্ষ থেকে 'আমীন ও সুদুক'এর খেতাব পাওয়াটাও কোন চাট্টিখানি কথা নয়। বরং এ এক অসাধারণ ঘটনা। যদি মক্কার অধিবাসীরা তাদের প্রত্যেক প্রজন্মের লোকদের মধ্য থেকে এক এক জন ব্যক্তিকে আমীন ও সুদুক উপাধি দিয়ে আসতো সেক্ষেত্রেও অনুরূপ আমীন ও সুদুক খেতাবধারী ব্যক্তিকে বাহ্যিকভাবে জাতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হত। কিন্তু আরবের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আরবরা তাদের কোন প্রজন্মেই এ ধরনের উপাধি কোন ব্যক্তিকেই দেয় নাই। বরং আরবদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত মাত্র একটি আর সেই এক জন ব্যক্তি হলেন সারওয়ারে কায়েনাত নবীকুলের শিরোমণি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ–রসূলে আযম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। সুতরাং আরবের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র একজন ব্যক্তিকে আমীন এবং সুদুক উপাধি দেওয়াটাই প্রমাণ করে যে তিনি একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন।

হযরত মুহামম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন–

ওঁহ পেশওয়া হামারা জিসসে হ্যায় নূরে সারা,

নাম উসকা হ্যায় মুহাম্মদ দিলবার মেরা এহী হ্যায়।

অর্থ –আদর্শ তো আমাদের তাঁর থেকেই নূরের ধারা।

পবিত্র নাম মুহাম্মদ সদা আমার হৃদয় হারা ॥

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলুলিল্লাহে উসওয়াতু হাসানা, লেমান কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াও মাল আখেরা ওয়া যাকারাল্লাহা কাছিরা। (সূরা আহযাব ঃ ২২)

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে। তাহার জন্য যে, আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে। এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

তিনি (সাঃ) ছিলেন মানবতার উচ্চতম প্রতীক। তিনি (সাঃ) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহোত্তম আদর্শ তাঁর বৈচিত্রময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যে কোন দিকেই তাকিয়ে দেখুন। তিনি অনুপম, তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনিই সর্বাধিক অনুকরণ যোগ্য। মহানবী (সাঃ) এর চরিত্রের মাহাত্ম্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষ্য এটাই যে, যারা তাঁর (সাঃ) নিত্যদিনের সাথী ছিলেন এবং সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্টভাবে চিনতেন তারা প্রত্যেকেই বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর (সাঃ) দাবীর সাথে সাথে তাঁকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছিলেন, আর যারা গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন–মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ)। তাঁর (সাঃ) জীবন ব্যাপী বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁর (সাঃ) এক চাচাতো ভাই হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মুক্তি প্রাপ্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ (রাঃ)। ইতিহাস এই সাক্ষ্য প্রমাণে ভরপুর যে, মহানবী (সাঃ) সংকট মুহূর্তে যেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন, স্বীয় কৃতকার্যতা ও বিজয় মুহূর্তেও তেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে, ওহুদের যুদ্ধে ও হুনায়নের যুদ্ধে তাঁর (সাঃ) সুমহান চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিক যেমন ব্যাপকভাবে আলোক সম্পাত করে তেমনি মক্কা বিজয় তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি ব্যাপকভাবে আলোপসম্পাত করে। সম্পদে-বিপদে। জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান, সংকট ও বিপদ যেমন তাঁকে হতাশ করে নাই। তেমনি কৃতকার্যতা ও বিজয় তাঁকে দাম্ভিক করে নাই। হুনায়নের যুদ্ধের দিন তিনি (সাঃ) যখন প্রায় একাকী রনাঙ্গনে ছিলেন এবং ইসলামের অস্তিত্ব প্রায় মিটে যাওয়ার মত অবস্থা হল তখনও তিনি (সাঃ) নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় শত্রু বহরে একা প্রবেশ করলেন আর তার মুখে বীরত্বের সাথে উচ্চারিত হল–আনা নাবীউ লা কাযেব আনা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব।

অর্থ ঃ আমি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নবী। আমি মিথ্যা বলছি না। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

আর যে দিন, মক্কা বিজয়ের সাথে সারা আরব ভূমি তাঁর (সাঃ) পদতলে প্রণত হল তখন অবিসংবাদিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি গর্বিত ও উদ্ধত হন নাই। তিনি শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শনে তাঁর (সাঃ) জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক এতীম বালক হিসাবে জীবন শুরু করেন এবং সমগ্র জাতির জন্য ভবিষ্যত নির্মাতা হিসাবে জীবন শেষ করেন। বালক হিসাবে তিনি ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান, যৌবনে তিনি ছিলেন নীতিবান। চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ন্যায় ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক। আবার মধ্য বয়সে তিনি হলেন বিবেক, বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি (সাঃ) অধিক বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার পাণি গ্রহণ করলেন এবং তারা সকলেই শপথ-পূর্বক তাঁর (সাঃ) বিশ্বস্ততা; ভালবাসা, পবিত্রতা ও মাহত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

পিতা হিসাবে তিনি (সাঃ) ছিলেন অতিশয় স্নেহশীল। বন্ধু হিসাবে তিনি (সাঃ) ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল।

একটি অধঃপতিত পাপাচারী সমাজের সংস্কারের কঠিন বোঝা যখন তাঁর কাঁধে অর্পিত হল এবং এ কারণে অত্যাচারিত ও নির্বাসিত হলেন তখনও তিনি (সাঃ) মোটেও শংকিত হলেন না বরং অত্যন্ত ধৈর্য সহ্য ও মর্যাদার সাথে তা বরন করে নিলেন। তিনি (সাঃ) সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করেছেন আবার বড় বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালনাও করেছেন। তিনি (সাঃ) পরাজিত অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন আবার বিজয়ীও হয়েছেন। তিনি (সাঃ) আইন প্রণয়ন করেছেন। আবার বিচারকের কাজও করেছেন। তিনি (সাঃ) ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা। "রাষ্ট্রপতি ও ধর্মপতিরূপে তিনি ছিলেন একইসাথে সীজার ও পোপের ন্যায়। কিন্তু তিনি (সাঃ) পোপের ন্যায় হওয়া

সত্ত্বেও পোপের ভূষণ-ভড়ং কিছুই তাঁর (সাঃ) ছিল না। তিনি শাসক ছিলেন বটে কিন্তু সীজারের ন্যায় রাজদন্ড তার ছিল না। নিয়মিত সেনাবাহিনীও নয়। নিয়মিত দেহরক্ষী ছাড়া নিয়মিত রাজত্ব ও রাজপ্রাসাদ ছাড়া যদি কোন মানুষের একথা বলার অধিকার থাকে যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে শাসন করছেন তবে সেই অধিকার একমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এরই ছিল। কেননা তিনি (সাঃ) সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিপতি যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের সকল যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনা তাঁর (সাঃ) হাতে দৃশ্যত: ছিল না। তিনি নিজ হাতে গৃহকর্ম করতেন। চামড়ার মাদুরে ঘুমাতেন। দৈনিক কয়েকটি খেজুর, রুটি ও পানি পান করতেন। সারাদিন বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করে রাত্রির প্রহরগুলি তিনি দোয়া ও প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন। এমন কি দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় ব্যাপী দোয়া করতে করতে তাঁর (সাঃ) পায়ের পাতা ফুলে যেত। বিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যিনি এতসব পরিবর্তিত অবস্থা ও অবস্থানের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন অথচ নিজে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হন নাই। (মুহাম্মদ এন্ড মুহাম্মদানিজম, বসওয়ার্থ স্মীথ)

এ ছাড়াও মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এর মানবতার আদর্শের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো। তিনি ছোট বড়, ধনী গরীব, দাস-দাসী, নারী, স্ত্রী, প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয়; এতীম বিধবা সকলের কাছে তিনি মানবতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনকি মক্কা বিজয়ের দিন সকলকে ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর (সাঃ) এই আদর্শকে বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কেউ হযরত আয়েশা (রাঃ)কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাবে বলেন–"আমাকে জিজ্ঞাসা করছ! তোমরা কি কুরআন করীম পড়নি? এই জমিন ও আকাশের সৃষ্টিকারী খোদার সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়? তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–'ইন্নাকা আলা খুলুকীন আযীম'

অর্থঃ হে রসূল! নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। নমুনা তো তাঁকেই মানায় যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদায় থেকে সর্বত্তোম নমুনা কায়েম করে থাকেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এ নবী সব বিষয়ে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, যদিও তা ঘরোয়া বিষয় হোক অথবা জাগতিক অথবা গোষ্ঠীগত বিষয় হোক অযথা সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক বিষয় হোক। আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য পাওয়ার কথা হোক। এটিই নমুনা যা তোমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত।" মহানবী (সাঃ) এর আদর্শ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "সেই মানুষ যিনি তাঁর রূহানিয়তে এবং পবিত্র শক্তিতে পূর্ণবেগে ধাবমান নদীর ন্যায়। জ্ঞানের দিক থেকে কাজের দিক থেকে এবং প্রমাণের দিক থেকে পরিপূর্ণ নমুনা দেখিয়েছেন এবং যাকে পরিপূর্ণ নমুনা বলা হয়েছে তিনি বরকত মন্ডিত নবী হযরত খাতামুল আম্বিয়া, খাতামুল মুরছালিন নবীদের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর উপর এমন রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর যা দুনিয়ার শুরু থেকে তুমি কারো উপর প্রেরণ কর নাই।"

(ইতমামুল হজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা ৩০)

মহানবী (সাঃ) নিজেই বলেছেন যে, "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" অর্থাৎ আমি উত্তম ও সর্বোচ্চ আখলাকের পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্তা সম্পর্কে বলা হয় "মুহাম্মদ সৃষ্টি না হলে এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হতো না। তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নবী (সাঃ) বলেন আমি তখনও খাতামাননাবীঈন হিসাবে লিখিত ছিলাম আদম যখন কাচা মাটিতে সিক্ত ছিল। (কানজুল উম্মাল)

আর সেই মানুষটি যদি মানবতার জন্য আদর্শ না হন তবে কে হবেন মানুষের জন্য আদর্শ? হযরত আব্দুল্লাহ্ আবি বিন আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "আঁ হযরত (সাঃ) এর মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না। তিনি (সাঃ) নাক উঁচু করতেন না। এই বিষয়কে মন্দ মনে করতেন ও এর থেকে বেঁচে চলতেন। তিনি (সাঃ) বিধবা ও মিসকিনদের সাথে কথা বলতেন, তাদের কাজ নিজে করে দিতেন, তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন। (সুনান দারমী)

অর্থাৎ অসহায় মহিলা মিসকিন এবং গরবীবদের সাহায্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতেন এবং এতে আনন্দবোধ করতেন এবং এটা শুধু তাঁর (সাঃ) জীবনের প্রাথমিক যুগের কথা নয় বরং যখন বিজয়ের পর বিজয় লাভ করেছিলেন, তখনও তাঁর (সাঃ) আখলাকে এমনই সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিল।'

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন আঁ হযরত (সাঃ) এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্ আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখ এবং মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে কেয়ামতের দিনও মিসকিনদের দলে রাখ। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন যে, কেন এমন আল্লাহ্র রসূল? এতে আঁ হযরত (সাঃ) বল্লেন, মিসকিনরা ধনীদের থেকে ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

অর্থাৎ, তাদের অহংকার এবং গর্ব বেশি থাকে না অসহায়ত্ব ও নম্রতা থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–হে আয়শা! কখনও কোন মিসকিনকে তিরস্কার করো না যদিও তোমাকে একটি খেজুরের টুকরা দিতে হয়। হে আয়শা মিসকিনদেরকে নিজের প্রিয়জনদের মত করো এবং তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী আরামের সাথে রেখো। খোদা তাআলা কেয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর কাছে আরামের সাথে রাখবেন। (তিরমিযী কিতাবুয্ যোহদ)

তিনি (সাঃ) অধিনস্তদের প্রতি নম্রতা দেখাতেন, সেবকদের প্রতি মেহেরবানী করতেন। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, " রসূল (সাঃ) লোকদের চেয়ে উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি (সাঃ) কোন কাজের জন্য আমাকে) পাঠালেন। আমি বল্লাম আমি যাব না। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে, ঐ কাজে যাব এবং এখনই করে আসব কেননা এটি হুযূর (সাঃ) এর আদেশ। আমি যাচ্ছিলাম। ছোট ছিলাম তাই বাজারে বাচ্চাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ছোট ছেলেরা খেলছিল। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম আর তাদেরকে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আঁ হযরত (সাঃ) আসলেন, এবং পিছন থেকে আমার কাঁধের উপর হাত রাখলেন। আমি ঘুরে তাঁর (সাঃ) দিকে দেখলাম। তাকিয়ে দেখলাম তিনি হাসছিলেন। বল্লেন, আনায়েস যে কাজের জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে গিয়েছিলে? আমি বললাম হে আল্লাহ্র রসূল

এখনই যাচ্ছি! আনাস বলেছেন। খোদার কসম আমি ৯/১০ বছর পর্যন্ত হুযূর (সাঃ) এর খেদমতে কাজ করেছি। আমার মনে নাই যে, তিনি (সাঃ) কখনো বলেছেন যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? অথবা কোন কাজ না করলে তিনি (সাঃ) বলেন নি যে, কেন কর নাই? (মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েল)

মহানবী (সাঃ) তো দুনিয়ার বুকে এসেছিলেন সুন্দর একটি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তার চলাফেরা আচার-আচরণ, কথা-বার্তা তাঁর সর্বোত্তম আদর্শকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি (সাঃ) ছিলেন সকলের জন্য রহমত স্বরূপ। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন–*ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লীল আলামীন।*

অর্থঃ এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া ১০৮)

তিনি (সাঃ) এসে দুনিয়াতে ৬৩ বছরের দীর্ঘ জীবনে রহমত বন্টন করে গেছেন। এবং সেই সাথে সকলকে শিক্ষাও দিয়ে গেছেন। তায়েফের লোকেরা যখন মহানবী হযরত (সাঃ) কে অবিশ্রান্তভাবে পাথর মারতে মারতে শহর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। তাঁর (সাঃ) পা দুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠল। যায়েদ (রাঃ) তাকে বাঁচাবার চেষ্টায় দারুন ভাবে জখম হয়ে গেলেন। কিন্তু এতেও জালেমদের প্রাণ ঠান্ডা হলো না। তারা তাঁর (সাঃ) পিছু ছাড়লো না। তারা পাথর ছুড়তে ছুড়তে আসতেই থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি পাহাড়ে এসে পৌঁছলেন ততক্ষণ তারা পিছু ছাড়লো না। এই লোকগুলো যখন তাঁর পিছু ধাওয়া করছিল, তখন তিনি (সাঃ) এদের জন্য ভীত হয়ে পড়ছিলেন যে, খোদার গযব না আবার তাদের উপর পড়ে। তিনি (সাঃ) আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন এবং কাতর প্রার্থনা করছিলেন–আল্লাহুমাগফিরলি কাওমি ফা ইন্না লাহুম লা ইয়াযলামুন।

অর্থ ঃ হে আমার আল্লাহ্। আমার প্রতি পক্ষকে ক্ষমা করে দাও; কারণ তারা জানে না। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি (সাঃ) তো পারতেন তাদের জন্য বদদোয়া করতে কিন্তু না করেন নি বরং তাদের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন আর তাঁর (সাঃ) ক্ষমা চাওয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি মানবতার আদর্শের এক প্রতীক ছিলেন।

তিনি (সাঃ) বাচ্চাদের প্রতিও তাঁর আদর্শের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি কখনো নিজের এবং অন্যের বাচ্চার মধ্যে পার্থক্য করেন নি। হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) এর সাথে নামায পড়েছি। তারপর তিনি (সাঃ) বাড়ীর দিকে গেলে আমি তাঁর (সাঃ) সাথে ছিলাম। অন্যান্য শিশুরাও রসূল (সাঃ) কে অনুসরণ করল আর তিনি (সাঃ) সেই বাচ্চাদের প্রত্যেকের গালে পরশ বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) আমার গালেও আদরের পরশ রাখলেন। আমি তাঁর (সাঃ) হাতের স্নিগ্ধতা এবং সুগন্ধি সেই ভাবে অনুভব করলাম যেন তাঁর (সাঃ) হাত তখনই আতর দানী থেকে বের হয়ে এসেছে। (মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েল)

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত (সাঃ) এর কাছে নবজাত শিশুদের হাজির করা হতো হুযূর (সাঃ) মোবারকবাদ দিতেন, দোয়া করতেন এবং গুড়তি দিতেন (মুখে মিষ্টি)। আজকাল গুড়তি দেওয়ার যে প্রথা তা আঁ হযরত (সাঃ) থেকেই।

এটাই ছিল নবী করীম (সাঃ) এর বাচ্চাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ভালবাসা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন–

"মুহাম্মদ (সাঃ) উভয় জগতের ইমাম ও প্রদীপ মুহাম্মদ (সাঃ) আকাশ ও পৃথিবী আলোকিতকারী। আমি খোদার ভয়ে তাঁকে খোদা বলতে পারি না। কিন্তু খোদার কসম তাঁর সত্তা মানব জীবনের জন্য খোদা দর্শনের দর্পণ স্বরূপ। (কিতাবুল বারিয়াহ্ পৃঃ ১৫৫-৫৭)

তিনি (সাঃ) যদি মানবতার আয়না না হন তবে কিভাবে তিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে আলোকিত করবেন। তাঁর (সাঃ) আচর-আচরণই প্রমাণ করে যে তিনি (সাঃ) ঠিকই খোদা দর্শনের আয়না।

মহানবী (সাঃ) প্রতিবেশীর জন্য দয়ার সাগর ছিলেন। হযরত আবুজার গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, হে আবুজার, তুমি যখন তরকারী পাক কর সেখানে ঝোলের জন্য পানি কিছু বেশি ঢেলে দিও তারপর পাকের পরে প্রতিবেশিকে স্মরণ রাখিও।" (মুসলিম কিতাবুল বিররে সিলাহ্)

হযরত আবুজার রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন "হে মুসলিম মহিলারা! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মহিলাকে হেয় বা তুচ্ছ মনে করবে না। যদি সম্ভব হয় বেশী না হলেও ছাগলের পা পাক করা ঝোল হলেও প্রতিবেশীর বাড়ীতে পাঠাতে পার।" (বুখারী)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন "হযরত জীব্রাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যাপারে এত বেশী জোরালো নসিহত বার বার করেছেন যে, "আমি ভেবেছিলাম প্রতিবেশীকে সম্পত্তির ওয়ারিশ করে দেওয়া হবে।" (আবু দাউদ কিতাবুল আদব)

পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে–ইন্নাস সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

অর্থঃ তুমি বল (হে মুহাম্মদ সাঃ)। নিশ্চয় আমার নামায আমার ইবাদত কুরবানী এবং আমার জীবন মরন সব কিছুই আল্লাহ্র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। (সূরা আল আনআম-১৬৩)

নামায, কুরবানী ও জীবন এবং মরণ এই সমস্ত মানব কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষেত্র ঘিরে আছে এবং আঁ হযরত (সাঃ) কে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে এই জীবনের সকল দিকই একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্যই উৎসর্গীকৃত। তাঁর সকল প্রার্থনা নিবেদিত ছিল আল্লাহ্র প্রতি তাঁর ধর্মের জন্য। যদি তিনি মৃত্যু কামনা করতেন তাও খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতেন।

আর এটা করা কি মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শের অনন্য দিক নয়? খাবার দাবারের ব্যাপারেও তিনি (সাঃ) সর্বদা অত্যন্ত সরল ছিলেন। খাবারের মধ্যে লবন বেশি হলো না কম হলো কিংবা রান্না খারাপ হলো এসব তিনি কখনো কিছু বলতেন না। এ ধরনের খাবার যতটা সম্ভব খেয়ে নিয়ে বাবুর্চীর মনোকষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু খাবার যদি একেবারে অযোগ্য হয় তাহলে হাত সরিয়ে রাখতেন এবং কখনোই বলতেন না এই খাবারে আমার অসুবিধা হচ্ছে। (বুখারী)

"হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, "আমাদের

বিছানা এত ছোট ছিল যে, যখন নবী (সাঃ) রাতে ইবাদত করার জন্য উঠতেন তখন আমি এক পাশে গিয়ে জড় হয়ে থাকতাম। এর কারণ হলো আমাদের বিছানা ছোট। যখন তিনি খাড়া হতেন তখন আমি আমার হাঁটু সোজা করতে পারতাম। আর যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন আমি আমার হাটু জড় করে নিতাম। (বুখারী)

"তাঁর (সাঃ) ইবাদত এমন ছিলো যে, অর্ধেক রাত কেটে গেলে তিনি খোদার ইবাদতের জন্য খাড়া হয়ে যেতেন। এমনকি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত। একবার তাঁর (সাঃ) ইবাদতের জন্য আয়শা মৃদু অনুযোগ করলেন, উত্তরে তিনি (সাঃ) বল্লেন, হে আয়শা! আমার কি উচিত নয় তাঁর ভালবাসার জন্য শুকোরগুজারী করা? (বুখারী)

আর এটাই ছিল তাঁর (সাঃ) আদর্শ, তিনি করে গেছেন এবং মানুষকে শিখিয়ে গেছেন। নবী করীম (সাঃ) সব সময় তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতামাতাকে পেয়েছে কিন্তু জান্নাতের অধিকারী হতে পারেনি, সে বড়ই হতভাগ্য অর্থাৎ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার কৃপার এত বড় উত্তরাধিকারী করে যে, যে ব্যক্তি তার বাবা-মায়ের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করে, সে অবশ্যই পুণ্য অর্জনকারী হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার কৃপার অধিকারী হয়। (মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) তাঁর সাথীদেরকে সব সময় বলতেন মানুষের চরিত্র বা আখলাক সেই রকমই হয়, যে রকম মজলিসে সে ওঠা বসা করে। কাজেই সব সময় সৎসঙ্গ রাখার চেষ্টা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যখন নবী (সাঃ) এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো তিনি অসুখের যন্ত্রণার কারণে কোঁকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মেয়ে ফাতেমা (রাঃ) একবার অস্থির হয়ে বল্লেন "আমি আমার বাপের কষ্ট আর দেখতে পারছি না'। নবী (সাঃ) তার কথা শুনে বল্লেন, সবুর কর। আজকের দিনটার পরে আর তোমার বাবার কোন কষ্ট হবে না। (বুখারী) একবার এক ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর কাছে আসল বন্দী হয়ে সে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) মনে করেছিল যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডের যোগ্য। তিনি বার বার নবী (সাঃ) এর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন যেন ইশারা পাওয়া মাত্রই লোকটাকে হত্যা করে ফেলতে পারেন। লোকটা যখন উঠে চলে গেল তখন ওমর (রাঃ) বল্লেন রসূলুল্লাহ্ এই লোকটি তো হত্যার যোগ্য। তখন নবী (সাঃ) বল্লেন তবে কেন তুমি তাকে হত্যা করলে না। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বল্লেন, আপনি যদি একটু চোখের ইশারা করতেন তবে আমি তাকে হত্যা করতাম। তখন রসূল (সাঃ) বল্লেন, নবী তো ধোকাবাজ হয় না। এটা কিভাবে সম্ভব যে আমি তাকে মুখে স্নেহ মমতার কথা বলব আর চোখে তাকে হত্যা করার ইশারা করবো। (ইবনে হিসাম)

নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে তিনি (সাঃ) বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নারীর অধিকার কায়েম করেছেন। কুরআন করীমের মধ্যেই পুত্রদের সাথে কন্যাদেরও পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করে দেওয়া আছে। একইভাবে মায়েদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে যথাক্রমে কন্যাদের এবং স্বামীদের সম্পত্তির এবং বিশেষ অবস্থায় বোনদেরকে ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর বুকে আর কোন ধর্মই এইভাবে নারীর অধিকার কায়েম করে নাই।

যখন নবী করীম (সাঃ) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তিনি সকল মুসলমানদেরকে সমবেত করে যে সকল নসিহত করেছিলেন তার মধ্যে একটা হলো, "আমি তোমাদেরকে আমার শেষ ওসিয়্যত এই করছি যে, নারীদের সাথে যেন সব সময় উত্তম আচরণ করা হয়। তিনি এ কথা প্রায়ই বলতেন, যার ঘরে মেয়েরা আছে এবং সে তাদের লেখাপড়া শিখায় এবং ভালভাবে তরবিয়ত করে খোদা তাআলা তার জন্য দোযখ হারাম করে দিবেন। (তিরমিযী)

জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) ছিলেন নূরুন আলা নূর অর্থাৎ আপাদমস্তক জ্যোতি।

মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে তাঁর (সাঃ) এই নসিহত ছিল, যখন শহরে কোন লোক মারা যায়, তখন লোকেরা যেন কখনই তার কোন খারাপীর কথা না বলে বেড়ায় বরং তার ভাল কথাই বর্ণনা করা উচিত। কেননা তার খারাপীর কথা বর্ণনার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। বরং তার পুণ্যের বর্ণনার মধ্যে এই মঙ্গল রয়েছে যে, তার জন্য মানুষের মনে দোয়া করার ইচ্ছা জাগবে। (বুখারী)

"খোদার প্রতি তাঁর (সাঃ) ভালবাসার অবস্থা এমন ছিল যে, শুকনো মৌসুমের পর যখন প্রথম বৃষ্টি হতো তখন তিনি তাঁর জিহ্বায় বৃষ্টির ফোঁটা নিতেন এবং বলতেন দেখো! আমার প্রভুর তাজা নেয়ামত।

তাঁর (সাঃ) বিবিগণের প্রতি তাঁর আচরণ অতি নম্র এবং ন্যায়ভিত্তিক একদিন তিনি (সাঃ) আয়শা (রাঃ) কে বল্লেন, হে আয়শা! যখন তুমি আমার উপর অভিমান কর তখন ঠিকই আমি বুঝতে পারি যে,তুমি আমার উপর অভিমান করেছ। তখন হযরত আয়শা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তা আপনি বুঝতে পারেন? তিনি (সাঃ) বল্লেন যখন তুমি আমার উপর খুশী থাক আর কোন কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তখন তুমি বলো মুহাম্মদের খোদার কসম। আর যখন আমার প্রতি নারাজ থাক আর কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তখন তুমি বল ইব্রাহীমের খোদার কসম। একথা শুনে হযরত আয়শা (রাঃ) হেসে উঠলেন এবং বল্লেন ঠিক কথা, আপনি ঠিকই ধরেছেন। (বুখারী)

যারা মানুষের সেবা করত নবী (সাঃ) তাদেরকে খুব ভাল বাসতেন। একবার 'তাই গোত্রের লোকেরা নবী (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধ করেছিল। তাদের কিছু লোক বন্দী হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমের কন্যাও ছিল। যখন সে রসূল (সাঃ) এর কাছে বল্ল সে হাতেম তাই এর মেয়ে, তখন নবী (সাঃ) তার সাথে অত্যন্ত সদাচার ও সম্মানের ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের সব লোকের শাস্তি তিনি (সাঃ) ক্ষমা করে দিলেন। (সিরাতে হালবিয়া, খন্ড-৩ এর পৃঃ ২২৭)

হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর চরিত্র জানবার জন্য তোমাদের কোন ইতিহাসের প্রয়োজন নেই। তিনি ছিলেন একজন সৎ, সত্যনিষ্ঠ, সরল ও প্রকাশ্য জীবনের অধিকারী মানুষ। তিনি যা বলতেন তাই করতেন আর যা করতেন তা বলতেনও। আমরা তাকে দেখেছি। তাই কুরআন করীম পড় এবং পড়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বুঝে নাও।

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

মুবাশ্বের মুরব্বী

ঈশ্বরনিন্দা (Blasphemy)

মানুষকে বাক-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে ইসলাম অন্য সব ধর্মের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে আছে। সন্দেহ নেই যে, ইসলাম নৈতিকভাবে এবং নীতিশাস্ত্রগতভাবে ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য কোন জাগতিক শাস্তি নির্ধারণ সমর্থন করে না, যদিও তা সমসাময়িক বিশ্বে, সাধারণভাবে সমর্থন করা হয়।

গভীর মনোযোগ সহকারে, ব্যাপকভাবে বার বার কুরআন শরীফ পাঠ করেও আমি তার মধ্যে এমন একটি আয়াতও পাইনি যাতে বলা হয়েছে যে, ইশ্বরনিন্দা মানব প্রদত্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যদিও পবিত্র কুরআন অতি কঠোর ভাষায় অশিষ্ট আচরণ ও অশালীন কথাবার্তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, অন্যদের অনুভূতিতে, কারণ থাক আর না থাক, আঘাত করার বিরুদ্ধে বলেছে, তথাপি ইসলাম না তো ইহজগতে ইশ্বরনিন্দার শাস্তিদানকে সমর্থন করেছে, না সেই ক্ষমতা কাউকে দান করেছে। পবিত্র কুরআনে ঈশ্বনিন্দার কথা বলা হয়েছে পাঁচ বারঃ

(১) দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ অর্থে বলা হয়েছে এভাবেঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে, ঐগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং ঐগুলির প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে বসিও না, যে পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, অন্যথায় সে ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদেরই মত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল মুনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (আন্‌ নিসা-৪ঃ১৪১)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

"এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেও যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও জালেম জাতির সঙ্গে বসবে না।" (আল্‌ আনআম-৬ঃ৬৯)

ঈশ্বরনিন্দার জঘন্য খারাপীর বিরুদ্ধেও কত সুন্দর প্রতিক্রিয়া!

ইসলাম ইশ্বরনিন্দা বা ধর্মনিন্দাকারীকে শাস্তিদানের ক্ষমতা কোনও মানুষের হাতে তুলে দেয় না। শুধু তাই নয়, ইসলাম এই কথাও বলে যে, যেখানে বা যে সভায় ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়, হাসি-ঠাট্টা করা হয়, সেই স্থান থেকে সাময়িকভাবে উঠে এসে বা ওয়াক-আউট করে ধর্মনিন্দা বা ঈশ্বরনিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাই শ্রেয়ঃ। সরাসরি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তো দূরস্থান, কুরআন করীম ঈশ্বরনিন্দা-কারীদেরকে বরাবরের জন্য বয়কট করবার কথাও বলে না। পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে যে, এইরূপ বয়কট ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে পারবে যতক্ষণ না সেই ঈশ্বরনিন্দা বন্ধ হয়।

(২) আবারও ঈশ্বরনিন্দার কথা বলা হয়েছে সূরা (অধ্যায়) আল্‌ আনআমে। এখানে, আনুমানিকভাবে, ঈশ্বরনিন্দার প্রশ্নটি শুধু আল্লাহ্‌র সম্পর্কেই আলোচিত হয়ানি, বরং তা আলোচিত হয়েছে মূর্তি ও পূজা-অর্চনার কল্পিত সব বস্তু সম্পর্কেও। এইরূপ কুরআনী সৌন্দর্য দর্শনেও যে কেউ অভিভূত না হয়ে পারে না, যখন সে পড়েঃ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"এবং তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদেরকে তাঁরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (উপাস্যরূপে) ডাকে, নতুবা তারা অজ্ঞতার দরুন শত্রুতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কৃতকর্মকে মনোরম করে দেখিয়েছি। অতঃপর, তাদের প্রভুর দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, তখন তিনি তাদেরকে তারা যে কাজকর্ম করতো তৎসম্বন্ধে অবহিত করবেন।" (আনআম-৬ঃ১০৯)

এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের মূর্তিগুলোর নিন্দা করতে। এখানে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কেউ যদি অনুরূপ কাজ করে বসে তাহলে অন্যেরাও প্রতিশোধমূলকভাবে, আল্লাহ্‌রই নিন্দায় রত হতে পারে। এই অনুমাননির্ভর আলোচনায় খোদা এবং মূর্তি বা দেবতাদের সম্পর্কে সমান শর্তে কথা বলা হয়েছে। এবং কোন ক্ষেত্রেই কোন জাগতিক শাস্তির কথা বলা হয়নি।

এই শিক্ষার নীতি গূঢ় ও গভীর প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। কেউ যদি কারো আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করে, তাহলে, দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার জন্মাবে সমান প্রতিশোধ গ্রহণের, তা তার ধর্মবিশ্বাস সত্য বা মিথ্যা, যা-ই হোক না কেন। কেউই অন্যভাবে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। এথেকে, যেকেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে যে, আধ্যাত্মিক অপরাধের প্রতিশোধ আধ্যাত্মিক পন্থাতেই নিতে হবে, ঠিক যেমন দৈহিক অপরাধের বিরুদ্ধে দৈহিক প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, কোনক্ষেত্রেই সীমালংঘন করা যাবে না।

(৩) পবিত্র কুরআনে হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কৃত নিন্দার (ঈশ্বরনিন্দার) কথা বলা হয়েছেঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝

এবং তাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে।" (আন্ নিসা-৪ঃ১৫৭)

এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের ঐতিহাসিক গোঁড়ামীর কথা বলা হয়েছে। এই আয়াত অনুসারে, ইহুদীরা মরিয়ম (আঃ)-কে অসতী বলে এবং ঈসা (আঃ)-কে একটি সন্দেহজনকভাবে জন্মগ্রহণকারী শিশু বলে এক প্রকার জঘন্য ঈশ্বরনিন্দার অপরাধ করেছে। এই আয়াতের আরবী শব্দ **'বুহতানান আযীম'** (যার অর্থ 'ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ') দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইহুদীদের এই আহম্মকীর নিন্দা করা হয়েছে।

(৪) একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে হযরত মরিয়ম এবং ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার কাজ করার অপরাধের জন্য ইহুদীদেরকে তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন করীম খৃষ্টানদেরকেও তিরস্কার করেছে এই জন্য যে, তারাও ঈশ্বরনিন্দার অপরাধে অপরাধী। কেননা, তারা দাবী করে যে, এক মানবী স্ত্রীলোকের গর্ভে খোদার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টা কুরআন করীম জঘন্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছে নিম্নোক্ত আয়াতে। তবু এখানে, না কোন ইহজাগতিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, না খোদা তাআলার বিরুদ্ধে নিন্দা করার অপরাধের জন্য শাস্তিদানের অধিকার কোন মানুষ বা মানবীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।

مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও (ছিল না)। এ অত্যন্ত জঘন্য কথা যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। তারা কেবল মিথ্যা বলছে।" (আল্ কাহ্‌ফ-১৮ঃ৬)

(৫) সবশেষে, আমি সব চাইতে স্পর্শকাতর, বিষয়টির কথা বলতে চাই–স্পর্শকাতর এই অর্থে যে, আজকের দিনের মুসলমানরা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) বিরুদ্ধে নিন্দার (ব্লাসফেমী) ব্যাপারে যতটা স্পর্শকাতর, ততটা স্পর্শকাতর অন্য আর কারও বিরুদ্ধে নিন্দার ব্যাপারে নয়, এমনকি খোদার নিন্দার বিরুদ্ধেও নয়। তবু, এখানে এমন একটা ভয়ানক ঈশ্বরনিন্দার ঘটনার কথা বলা যায়, যার উল্লেখ কুরআন করীমে করা হয়েছে, যা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কিত–যাকে ইসলামের ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে মুনাফেকদের নেতা বলে।

একবার একটা যুদ্ধের অভিযান থেকে ফেরার সময়, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই অন্যান্যদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল যে, তারা মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই, মদীনাবাসীদের মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তি সেখানকার সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

"তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দেবে, অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর রসূল এবং মুমেনদের জন্য; কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়। (আল্ মুনাফেকুন-৬৩ঃ৯)

অভিযাত্রীদের সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, এই অবমাননাজনক কথা সে বলছে হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে।

তারা ঘৃণায় এবং ক্রোধে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, অনুমতি পেলে তারা তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

প্রামাণ্য বর্ণনায় আছে যে, এই ঘটনায় উত্তেজনা এমন চরমে পৌঁছেছিল যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইর পুত্র রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে স্বহস্তে তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। সেই পুত্র এই যুক্তি দেখালো যে, যদি অপর কেউ তার পিতাকে হত্যা করে তাহলে, হতে পারে, পরবর্তীকালে সে অজ্ঞতাবশতঃ, তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করবে। শত শত বৎসর ধরে আরবদের মধ্যে এই প্রথা চলে আসছিল যে, তারা তাদের নিজেদের এবং নিকট আত্মীয়দের সামান্য অপমানেরও প্রতিশোধ গ্রহণ করতো। সম্ভবতঃ, এই প্রথার কারণেই ঐ পুত্রটি তার পিতাকে হত্যা করবার অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু, হযরত রসূলে পাক (সাঃ), না তার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, না তিনি তাঁর সাহাবীগণের কাউকে সেই মুনাফেক আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে কোন প্রকারের কোন শাস্তিদানের অনুমতি দিলেন। (ইবনে হিশাম কর্তৃক বর্ণিতঃ ইবনে হাশিমঃআস্ সিরাতুন নব্বীয়া, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৫৫)।

ঐ অভিযান থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই শান্তিতেই বসবাস করছিল। অবশেষে, যখন সে স্বভাবিকভাবে মারা গেল, তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো যে, হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্র ছেলেকে তাঁর (সাঃ) নিজের পিরহান (শার্ট) দিলেন এবং তা দিয়ে তার পিতার কাফন তৈরী করতে বললেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিজের জামা দান করার এই ব্যাপারটি এমন একটি অনন্য সাধারণ আশীর্বাদ ছিল যার বদলাতে সাহাবীগণের যে কেউ আব্দুল্লাহ্র পুত্রকে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। শুধু তাই না, রসূলে পাক (সাঃ) তার জানাযার নামাযে ইমামতী করার জন্যও তৈরী হয়ে গেলেন। এতে সাহাবীদের অনেকেই নিশ্চয় গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে থাকবেন, বিশেষতঃ, যাঁরা আব্দুল্লাহ্র উপরোক্ত জঘন্য অপরাধকে ক্ষমা করতে পারছিলেন না। হযরত উমর (রাঃ) যিনি পরবর্তী কালে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন, তিনি সাহাবীদের সেই চাপা মর্মবেদনাকে, অবশেষে, ব্যক্ত না করে পারলেন না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন নামাযে জানাযার জন্য রওয়ানা হলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) হঠাৎ এগিয়ে গেলেন এবং সামনে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর (সাঃ) সিদ্ধান্ত বদলাবার অনুরোধ জানালেন। এবং এটা করতে গিয়ে হযরত উমর (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে কুরআন পাকের একটি আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যে আয়াতে এমন কিছু সংখ্যক মুনাফেকের প্রতি ইংগিত করা আছে যাদের ক্ষমার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) সত্তুর বার প্রার্থনা বা শাফায়াত করলেও তা কবুল করা হবে না বলে বলা হয়েছে। (প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, সত্তুর সংখ্যাটিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না কেননা, আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী, অধিক সংখ্যা বুঝাতে জোর দেওয়ার জন্যই সত্তুর সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়।)

যাহোক, রসূলে পাক (সাঃ) একটু মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'উমর, পথ ছাড়, আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি। যদি আমি জানতে পারি যে, আমি সত্তুর বার তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না তাহলে, আমি তার জন্যে সত্তুর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবো'। অতঃপর, রসূলে করীম (সাঃ) সেই জানাযার নামাযের ইমামতী করলেন। (বুখারীঃ ২য় খন্ড, কিতাব আল্ জানায়েয, পৃঃ ১২১, এবং রাব আল্ কাফন, পৃ ৯৬,৯৭)

এই ঘটনা তাদের বিরুদ্ধে একটি যথোচিত জবাব, যারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যে, ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার (সাঃ) নিন্দাকারীদের জন্য একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু-দন্ড।

এবং এটাই সেই ধর্ম, যা, অবশ্যই দুনিয়ার বুকে আন্তঃ-ধর্মীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে।

(Islam's Response to Contemporary Issues পুস্তকের বাংলা অনুবাদকৃত পুস্তক থেকে পৃষ্ঠা ৪৫-৫০)

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে
অনুবাদ ঃ **শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান**

সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও ২৩শে মার্চ

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার প্রতি ১৮৮১ সনে মামুরিয়াতের (প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার) প্রথম ইলহাম হয়। ইলহামটি হলোঃ

কুল ইন্নি উমেরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুওমেনিন অর্থাৎ–তুমি বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম ঈমান এনেছি। ১৮৮২ সনে বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশের মাধ্যমে এই ঘোষণা মানুষ জানতে পারে। তারপর ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সনে লুধিয়ানাতে সূফি আহমদ জান সাহেব-এর বাড়ীতে তিনি ইমাম মাহদী হিসেবে প্রথম বয়াত নেন। তাই আহমদীয়া জামাতে ২৩শে মার্চের গুরুত্ব অনেক ব্যাপক। ১৯০১ সনে তিনি তাঁর জামাতের নাম জামাতে আহমদীয়া রাখেন। ২৬শে মে ১৯০৮ সনে তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন। ২৭শে মে ১৯০৮ সনে কাদিয়ানের বেহেশতি মাকবেরাতে তিনি মদফুন হোন। এভাবে মামুরিয়াতের দাবীর পর দীর্ঘ ২৭ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। সূরা হাক্কার ৪৫ থেকে ৪৭ নং আয়াত তাঁর দাবীর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আল্লাহ্ বলেন, অর্থাৎ

এখন একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে কত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন যে , তিনি যদি নিজ থেকে কোন আয়াত রচনা করে বলতেন যে, এটি আল্লাহ্র বাণী। অথচ তা আল্লাহ্র বাণী না, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই তাকে কঠোর হস্তে দমন করতেন, পাকড়াও করতেন, চরম শাস্তি দিতেন, তার জীবন শিরা কেটে দিতেন। জীবন শিরা কাটার অর্থ কি? একেবারে ধ্বংস করে দেয়া, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা দাবী করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি বাণী নাযেল করেন নাই, কিন্তু সে দাবী করছে যে, নাযেল করেছেন। দেখুন যেখানে আল্লাহ্ বলছেন যে, যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও এমন ভয়ানক অপরাধ করেন (নাউযুবিল্লাহ) তবু তাঁর শাস্তি মৃত্যুদন্ড! অনিবার্যরূপে ধ্বংস। তার চেয়েও বড় লক্ষ্যণীয় এই যে, শাস্তি দেবার কাজটা স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন। কোন মৌলভী সাহেবদের উপর এই দায়িত্বভার ন্যাস্ত করেননি। আজ আমাদের বিরোধী আলেমরা উঠে পড়ে লেগেছেন, অবিরাম হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন যে, তারা মির্যা সাহেবের বিনাশ করেই ছাড়বেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ্র কাছে তারা কি উত্তর দিবেন? তারা কুরআনের কোন্ আয়াত বা কোন্ হাদীসে দেখল যে যাকে তারা ভন্ড দাবীদার বলে মনে করে তাকে তারাই শায়েস্তা করবে, তাকে শাস্তি দিবে, জ্বালাবে পোড়াবে এবং তার সর্বনাশ করবে?

এমন এক ব্যক্তি যে বলে যে, 'আল্লাহ্ আমার উপর তাঁর কালাম নাযেল করেছেন'। অতঃপর সে ঐ সব বাক্য (আয়াত /বাণী/কথা/ কালাম) প্রকাশ ও প্রচার করে, আর কোন মতেই এ সমস্ত কালাম প্রচার ও প্রকাশে বিরত হয় না, আর আল্লাহ্র নামে কসমও খায়। আল্লাহ্র শপথ নিয়ে আযাবের শর্ত রেখে কসম খেয়ে প্রচার করে যে, ইহা আল্লাহ্র কালাম বা আল্লাহ্ আমাকে ওহী করেছেন, এবং বহু অত্যাচার সত্বেও সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলে যে আমাকে যতই শাস্তি দাও আমি আমার দাবী থেকে বিরত হব না। আর তার ইলহামের মধ্যে এ ধরনের ইলহামও থাকে যে, আল্লাহ্ তাকে বিজয় দান করবেন এবং আল্লাহ্ তাকে সকল প্রকারের আক্রমণ থেকে বাঁচাবেন, আর এমন ইলহামও থাকে যে, তাঁর বিরোধীদেরকে আল্লাহ্ সফলতা দিবেন না। বরং তাদের শাস্তি দিবেন। আর যদি কালক্রমে ঐ সব ইলহাম পূর্ণও হতে দেখা যায় অর্থাৎ এই দাবী কারক যদি দিন দিন প্রসার লাভ করতে থাকে আর লোকেরা ধীরে ধীরে তাকে গ্রহণ করতে থাকে, আর যারা তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তাদের উপর শক্ত জুলুম-অত্যাচার করলেও তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে না, বরং যারা ঐ দাবীদারকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করে তারাই যদি বার বার ব্যর্থ হয় এবং সমাজে লাঞ্ছিত হয় আর অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তর্কাতর্কি করে সে ক্ষেত্রে আপনারা কি ফয়সালা দিবেন? একটু চিন্তা করে দেখুন।

এমন দাবীদার যদি বার বার বিরোধীদের তুমুল আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়, আর কোন প্রকাশ্য শক্তি তাকে সাহায্য করছে, এমন প্রমাণও না পাওয়া যায় , আর এই দাবীকারকের হাজার হাজার ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হতে থাকে, আর তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরেরও বেশী কাল স্ব-সম্মানে জীবন-যাপন করে পরিপক্ক বয়সে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেন; তাহলে ঐ ক্ষেত্রে কি করে আপনি বলবেন যে, সে ভন্ড নবী বা মিথ্যা দাবীকারক ছিলো। অতিরিক্ত আরো এই যে, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর খেলাফত জারী রয়েছে। বর্তমানে ৫ম খেলাফত চলছে এবং তাঁর জামাত অতি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, কোটি কোটি পথহারা মানুষ আজ তাকে সত্য যাচাই করে গ্রহণ করছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, এমন ভন্ড মিথ্যা দবীদারকে আমি এমন কঠোর শাস্তি দিই যে, কেউ তাকে আমার আযাব থেকে বাঁচাতে পারে না। এমন কি যদি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও এই দোষে দোষী হন তবুও কোন নম্রতা দেখানো হতো না! এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এরপর যদি কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবী করেন। অতঃপর উল্লিখিত উপায়ে ২৩ বছরের বেশী কাল জীবিত থাকেন। তবে তাঁকে কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করবেন? আর যদি অস্বীকার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তবে খুব চিন্তা করে দেখুন, আলোচ্য আয়াতকে কাফেররা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার বিপক্ষে ব্যবহার করতে পারার সুযোগ সৃষ্টি হয় নাকি?

তারা বলতে পারে যে, হযরত রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার বাণী প্রাপ্ত হবার দাবীর পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন, আর মির্যা সাহেবও তদ্রুপ। এখন মির্যা সাহেব যদি সত্য না হোন তবে হযরত রসূল (সাঃ) এর সত্যতার কি প্রমাণ?

মহান খোদা তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)কে প্রত্যাদিষ্ট করে হাজার হাজার ইলহাম নাযেল করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ " হে আহমদ! আল্লাহ্ তোমার মধ্যে বরকত রেখেছেন। তুমি যা চালিয়েছ, তা তুমি চালাও নাই বরং আল্লাহ্ চালিয়েছেন। .....তুমি বল, আমি আল্লাহ্র তরফ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। এবং আমি সর্ব প্রথম ঈমান এনেছি।.....তুমি বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা (বাতিল) পলায়ন করারই কথা ছিল।.....সমস্ত বরকত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে...তোমার প্রতি যারা হাসি বিদ্রুপ করবে আমরা তাদের জন্য যথেষ্ট! .....আমরা নিশ্চয় তোমাকে বিজয় দান করব, প্রকাশ্য বিজয়! ....." (বারাহীনে আহমদীয়া-৩য় খন্ড)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, "দুনিয়া মে এক নাযির আয়া পর দুনিয়া নে উসে কবুল না কিয়া, লেকিন খুদা উসে যরুর কবুল কারেগা আওর বাড়ে যোর আওয়ার হামলোঁ সে উসকি সাচ্চায়ী যাহের কারেগা"–অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি, পরন্তু আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তার সত্যকে প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা আরো ইলহাম করেন "I love you, I shall give you a large party of Islam." –এ ধরেনের হাজার হাজার ইলহাম সমূহ হযরত মসীহে মাওউদ ও মাহদী (আঃ) এর উপর নাযেল হয়েছে বলে তিনি দাবী করেছেন এবং যথা সময়ে এই সব ইলহাম তিনি প্রচারও করতে থাকেন। আর এই সমস্ত ইলহামের পবিত্র বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং পরেও হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

অনেক ভাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সত্যতা যাচাই করা যায়। কারণ যে জিনিষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়, কোন সমস্যা হয় না। আমরা জানি, এই দুনিয়াতে মানুষ সাধারণত 'ইলমুল ইয়াকীন' দ্বারাই বিশ্বাস আনয়ন করে থাকেন, তাই আসুন এই পন্থায় হযরত মির্যা সাহেব এর সত্যতাকে যাচাই করি।

পবিত্র কুরআন থেকে বিশ্বাস অর্জনের তিনটি রাস্তা পাওয়া যায়। (১) ইলমুল ইয়াকীন (২) আইনুল ইয়াকীন ও (৩) হাক্কুল ইয়াকীন।

ইলমুল ইয়াকীন ঃ কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এই জ্ঞান অর্জন করে থাকি যে ইসলামে এক চরম অধঃপতনের যুগ আসবে, সেই অধঃপতন থেকে উদ্ধারের জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আসবেন। এখন চিন্তার বিষয় আমরা বর্তমান কোন যুগে বাস করছি?

আইনুল ইয়াকীন ঃ আজ আমরা নিজ চোখে দেখলাম যে, রসূল করীম (সাঃ) ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা এক এক করে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যেমন– (১) মিথ্যার প্রাদুর্ভাব (ইমাম মাহদী (আঃ) এর যুগের প্রধান লক্ষণ)। (২) নারীদের মধ্যে নগ্নতার আধিক্য (নারীর পর্দা নাই)। (৩) নারীর অধিকার আদায়ের নাম অসহিষ্ণুতার প্রসার (৪) নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য। (৫) জাতির নেতা ছোট লোক হবে। (৬) খৃষ্টানদের প্রাধান্য হবে। (৭) ইসলামের কেবল নাম থাকবে। (৮) কুরআনের কেবল অক্ষর থাকবে। (৯) মসজিদ সুন্দর হবে কিন্তু হেদায়াত শূন্য হবে। (১০) কতক আলেম আকাশের নিকৃষ্টতম জীব হবে (যারা ফিৎনা ছড়াবে) (মিশকাত)।

প্রশ্ন উঠে, নিদর্শনাবলী সব পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকলে সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি কোথায়? আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) যখন বললেন আর কুরআনও এই ব্যাপারে বলে তা হলে সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি কোথায়? আজ দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ খানা কা'বা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাই নিশ্চিত ইমাম মাহদী (আঃ) এসেছেন। এছাড়া তাঁর সত্যতার জলন্ত আরেকটি প্রমাণ হলো চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ–

নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দুইটি লক্ষণ আছে যা আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নিদর্শন রূপ প্রদর্শিত হয় নাই। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং (সূর্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে" (দারকুতনী-১৮৮ পৃঃ)।

হাদীসে বর্ণিত এই নিদর্শন থেকে স্পষ্টই আল্লাহ্র ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিদর্শন। এ ধরণের নিদর্শন প্রদর্শন করা অন্য কোন শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই আল্লাহ্র তরফ থেকে জ্ঞান লাভ করেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতএব, তিনি আল্লাহ্র সত্য নবী ছিলেন। এ থেকে অকাট্য ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে যুগে এই অপূর্ব নিদর্শন প্রদর্শিত হবে, নিঃসন্দেহে সেটা হযরত মাহদী (আঃ) এর যুগ। আজ সারা পৃথিবীর জন্য, বিশেষ ভাবে মুসলমানদের জন্য এ এক সুসংবাদ যে, উক্ত নিদর্শন ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। আমাদের পূর্ব গোলার্ধে ১৮৯৪ ইংরেজী সালে এবং পশ্চিম গোলার্ধে ১৮৯৫ ইং সালে। বলা বাহুল্য, ঐ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন দাবীদার ছিল না এমন কি আজও এমন কোন দাবীকারক ময়দানে দাঁড়ায় নাই। আরো উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশ পাবার পাঁচ বছর পূর্বে তিনি দাবী করেছিলেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মাহদী। তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাঁর দাবীর পাঁচ বছর পরে এই নিদর্শন প্রকাশ হবে এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর দাবী সত্য প্রমাণিত হবে। আল্লাহু আকবার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আলেম সমাজের বড় অংশ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরোধীতা করাটাই ঈমানের অঙ্গ বলে ধরে নিলেন। আর সর্বপ্রকার বিরোধিতা আরম্ভ

করলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না।

হাক্কুল ইয়াকীন ঃ উপরোক্ত নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকেই আমরা সত্যবাদী দেখতে পাই। কেননা তিনিই এক মাত্র দাবী কারক। তিনি খোদার কসম খেয়ে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন এবং তার দাবীর পরবর্তী কালেও বর্ণিত ওই সব নিদর্শনকে আমরা পূর্ণ হতে দেখছি।

প্রিয় বন্ধুগণ, হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতার লক্ষণ পবিত্র কুরআনের আলোকে আরো বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরছি। যাতে তাঁর সত্যতা সম্পর্কে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ না থাকে। সত্যতা যাচাই করার জন্য দাবীকারকের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, যেমন (ক) দাবীর পূর্ববর্তী জীবন, (খ) দাবীর পরবর্তী জীবন এবং (গ) তাঁর মৃত্যু পরবর্তী কালে তাঁর কৃত দাবীগুলোর স্বরূপ।

(১) নবীর নবুয়তের দাবীর পূর্বের জীবন পবিত্র হয়। যেমন পবিত্র কুরআন শরীফে (সূরা ইউনুস-১৭) আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

অর্থাৎ–ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে এক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে আমার জীবনের এক দীর্ঘকাল কাটিয়েছি। আমার দাবীর পুর্বের বিগত ৪০ বছর পর্যন্ত আমার স্বভাব চরিত্র, চাল-চলন দেখেছো, তারপর আমার সম্বন্ধে তোমরা কি ধারণা পোষণ কর? আমি কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? আমি যদি এত কাল সত্যবাদী ছিলাম, তবে আজ এই পৌঢ় বয়সে কি করে মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম? আজ এই বয়সে আমার মিথ্যা বলার কি প্রয়োজন ছিল?

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত রসূলে করীমের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ এটা উল্লেখ করলেন যে, তিনি দাবীর পূর্বে পরম সত্যবাদী ছিলেন। আর দাবীর পূর্বের সত্যবাদীতা, তার দাবীর সত্যতার পক্ষে একটি শক্তিশালী দলিল। অতএব আমরা এথেকে জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্ যাঁদের নির্বাচিত করে (মামুর করে) পাঠান, তাঁদের দাবীর পূর্বের জীবন-চরিত নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র হয়ে থাকে। এই নিয়ম অনুসারে যেমন দেখা যায় যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সত্যবাদীতার কথা তাঁর শত্রুতারও স্বীকার করতেন। ঠিক তেমনই ঘটনা ঘটেছে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময়। হযরত মির্যা সাহেবের স্বভাব-চরিত্রও ছিল নিষ্কলঙ্ক এবং পাক-পবিত্র। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ঘোর বিরোধিরাও প্রকাশ্য স্বীকারাক্তি দিতেন যে তিনি কেমন পবিত্র প্রকৃতির ছিলেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর কয়েকজন ঘোর বিরোধীদের উক্তির দিকে লক্ষ্য করুন ঃ–

* মৌলানা জাফর আলী খান, সম্পাদক, জমিন্দার পত্রিকা। তিনি হিন্দুস্থানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। যিনি আজীবন আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা করে গেছেন। তাঁর পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব সাক্ষী দিয়েছেন ঃ "মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০/৬২ ইং সালে সিয়ালকোটে চাকুরীরত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২/২৩ বছর হবে। আমি স্বচক্ষে দেখে সাক্ষী দিচ্ছি যে, "তিনি যৌবনে একজন খুবই সালেহ এবং বুযুর্গ ছিলেন" (জমিন্দার, ৮ই জুন, ১৯০৮)

* আহমদীয়া জামাতের অন্যতম বিরোধী নেতা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভী লিখেছেন ঃ "বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ) আমাদের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকলের অভিজ্ঞতা অনুসারে শরিয়তে মুহাম্মদীয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরহেযগার ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন"। (এশায়াতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯ম সংখ্যা)।

* তিনি আরো বলেছেন ঃ "বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক ইসলামের এমন একজন সেবক ছিলেন, যিনি তাঁর জান, মাল, লিখনী, বক্তৃতা দিয়ে ইসলামের খেদমতে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যার তুলনা ইতিপূর্বে মুসলিম জাহানে খুবই বিরল।" (এশায়াতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭ম সংখ্যা)।

আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দাবীর সাথে বলেছেন ঃ "তোমরা আমার বিগত জীবনের (চরিত্র) উপর কোন প্রকার কলঙ্ক, মিথ্যা রচনা, মিথ্যাবাদিতা বা ধোকাবাজির অপবাদ বা অভিযোগ আনতে পারবে না। যার ফলে বলতে পারবে যে, এই ব্যক্তি অতীতেও মিথ্যা বলা বা মিথ্যা রচনায় অভ্যস্থ। অতএব তার এ দাবীও মিথ্যা। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার চরিত্রের উপর কোন কলংকের দাগ দেখাতে পারে? সুতরাং এটা আল্লাহ্র ফজল (কৃপা) যে, তিনি আমাকে প্রথম থেকেই তাকওয়ার উপর কায়েম রেখেছেন। এবং চিন্তাশীলদের জন্য এটা একটা নিদর্শন" (রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃঃ ৬৪)।

অতএব যে মানদন্ডে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পাশ করেছেন সেই মানদন্ডে তাঁর গোলামও পাশ করেছেন।

(২) দাবীর পরবর্তী জীবনে চরম বিরোধিতা নবীদের সত্যতার এক বড় দলিল। যেমন পবিত্র কুরআনে (সূরা ইয়াসিন-৩১) উল্লেখ রয়েছে–

অর্থাৎ–পরিতাপ! বান্দাদের জন্য, তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই যার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নাই। আমরা সবাই জানি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য দাবীই করেছিলেন এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন বাধার সম্মুখীন হননি। আমরা দেখতে পাই তিনি দাবীর প্রথম থেকেই চরম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে থাকেন। আর দিন দিন বিরোধিতা বাড়তেই থাকে। অবশেষে তিনি দেশ ত্যাগ করতে পর্যন্ত বাধ্য হোন। তার পর যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। আজীবন হুযূর (সাঃ) কে চরম যুলুম-অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। অবশেষে চূড়ান্ত বিজয় আসে। কিন্তু এর নামতো ব্যর্থতা নয়। তিনি কি ব্যর্থ হয়েছিলেন? হাজার হাজার বিরোধীরা কি তাকে ধ্বংস করতে পেরেছে?

অনুরূপভাবে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)ও প্রথম থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে থাকেন। দিনের পর দিন আক্রমণের মাত্রা

বাড়তে থাকে। খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সবাই মিলিত ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকে প্রবলভাবে। এমনকি খৃষ্টান পাদ্রীরা মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা করে, আর মুসলমান মৌলানারা মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেয়। কিন্তু মির্যা সাহেবের অপরাধ কি? অপরাধ এই যে, তিনি ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশে মাহদী হওয়ার দাবী করেন। আর এই দাবী যে, খৃষ্টান সহ অন্যান্য সব ধর্ম আজ বাতিল। একমাত্র ইসলামই সত্য ও আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। আমি মাহদী হয়ে এসেছি ইসলামকে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, সারা জীবন বিরোধীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। আর হযরত মির্যা সাহেব আজীবন সম্মান লাভ করে গেছেন। কোন জাগতিক শক্তি কোন দিন মির্যা সাহেবকে কোন প্রকার সাহায্য করেনি। সর্বক্ষেত্রে ও সব সময় আসমান থেকে আল্লাহ্‌র গায়েবী সাহায্যই মির্যা সাহেবের সাথে ছিল।

১৮৯১ সালে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভীর নেতৃত্বে দুই হাজার আলেম মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেন, এর ফলশ্রুতিতে কি মির্যা সাহেব ধ্বংস হয়ে গেছেন? এ ছাড়া মির্যা সাহেব এর বিরুদ্ধে সেই সময় অনেক বড় বড় ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিন্তু পরিশেষে কি দেখা গেল, এর যারা বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে এমনভাবে আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংস করেছেন যে আজ তাদের বংশধর পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেই সত্য দাবীকারকের বংশধরগণ আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের সেবা করে চলেছে। সমগ্র পৃথিবীতে আজ তার পতাকা পত পত করে উড়ছে। কারণ যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন তাকে বিজয়ী করা আল্লাহ্‌রই কাজ। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ "আল্লাহ্ ফয়সালা করে নিয়েছেন যে, নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী" (সূরা মুজাদেলা, আয়াত নং-২২)

এই আয়াত থেকে আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি যে, যদি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আগমনকারীর দাবী সত্য হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা তাকে বিজয় দান করবেন এবং করেন। এখানে পরম বিজয়ের কথা বুঝানো হচ্ছে। যেমন আমরা দেখতে পাই –

বিরুদ্ধবাদীদের নানা চ্যালেঞ্জের সামনে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বিজয় লাভ করেছেন।

দোয়ার মোকাবেলায় তিনি বিজয় লাভ করেন।

আর্থিক ভাবেও আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিজয়ী করেন।

একতাবদ্ধ করার দিক থেকেও তিনি বিজয়ী।

প্রচারের ক্ষেত্রেও তিনি বিজয়ী

দোয়ার কবুলিয়তের দিক থেকেও বিজয়ী

জ্ঞানের মোকাবেলায় তাঁকে বিজয়ী করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খন্ডে ইসলামের স্বপক্ষে ৩০০টি দলিল ও যুক্তি দেন। এবং আর্য সমাজ ও খৃষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দেন যে, তোমরা যদি পুরোটা বা অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশও খন্ডন করতে পার, তাহলে ১০ হাজার রুপী পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি আজ পর্যন্ত কারো হয়নি। এসব থেকে স্পষ্টই ফুটে উঠে যে ইমাম মাহদী (আঃ) এর দাবী সত্য। চার দিক থেকে চরম বিরোধিতা সত্বেও ধীরে ধীরে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে প্রসারতা ও সমর্থন লাভ করেছেন, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর জামাত দ্রুত প্রসার লাভ করে চলছে। তাই উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, যেভাবে পৃথিবীতে ইমাম মাহদীর জামাত প্রসারিত হচ্ছে তা তাঁর সত্যতারই সুস্পষ্ট এক দলীল।

দাবীকারকের মৃত্যুর পরবর্তী কালে তার প্রতিষ্ঠিত জামাতের অগ্রগতি তাঁর সত্যতার দলিল ঃ

(৩) দাবীকারকের সত্যতার আরো একটি বড় প্রমাণ হলো তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাতের অবস্থা। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দিবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এবং এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা হবে দুষ্কৃতকারী " (সূরা নূর আয়াত-৫৬)

অনেক বুযুর্গ তফসীরকারকগণ লিখেছেন যে, এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত রসূল (সাঃ) এর পরে খেলাফতে রাশেদা কায়েম হয়েছিল। আর এই আয়াতের ভবিতব্য অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পরেও ঐ রূপ খেলাফত কায়েম হবে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসেও তা উল্লেখ রয়েছে। যেমন রসূল করীম (সাঃ) বলেন ঃ

হযরত নু'মান বিন বশীর হুযায়ফা হতে বর্ণিত হয়েছে যে–"হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন অতঃপর, আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। এর পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং

তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর, আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহদী মাহুদ ও মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম-এর আগমনের পর) পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর, হযরত আকদাস (সাঃ) নীরব হয়ে গেলেন।" (আহমদ-বাইহাকী)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে 'খিলাফত আলা মিনহাজেন্ নবুয়্যত' প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে ইলহামের ভিত্তিতে "আল ওসীয়্যত" পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর জামাতের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা 'খিলাফতে আলা মিনহাজিন নবুওয়ত, কায়েম করবেন। সুতরাং তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক, তাঁর ইন্তেকালের পর ২৭শে মে, ১৯০৮ ইং সালে হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব (রাঃ), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর অন্যতম সাহাবী, জামাতের প্রথম খলীফার পদ অলংকৃত করেন। সেই খিলাফত আজও বলবৎ রয়েছে এবং ২০০৮ সালে খিলাফতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জুবিলী পালিত হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জামাতে আহমদীয়ার খিলাফত শত বৎসর পরেও অত্যন্ত সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তম রূপে ক্রিয়াশীল ও তৎপর রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ইসতিখলাফে (সূরা নূর-৫৬) বর্ণিত খিলাফতের কার্য প্রণালী ও কার্যধারা এবং সকল বৈশিষ্টাবলী আহমদীয়া জামাতের কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে সুসম্পাদিত হয়ে চলছে। যদি এটি প্রমাণ হয় যে, আহমদীয়া খিলাফতে উল্লিখিত সকল বৈশিষ্টাবলী বিরাজমান, তবে এটাও প্রমাণ হয় যে, হযরত মির্যা সাহেব সত্য দাবীকারক। কারণ তিনি যদি সত্য না হতেন তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পক্ষে দাঁড়াতেন না।

আলোচনা কালে আমরা বড় বিস্ময় এবং কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করছি যে, জামাতে আহমদীয়ার এই খেলাফতকে বানচাল ও বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অতি সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চলিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আজও এই চেষ্টা চলছে। এখানে এই খিলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং শুধু এতটুকু উল্লেখ করি যে, আহমদীয়া খিলাফতকে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর হাতে এজন্য কায়েম করেছেন, যেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইসলাম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। পৃথিবীর কোন শক্তিই এই জামাত এবং খিলাফতকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে না। আমরা এটাও জানি, সত্যেরই বিরোধিতা হয়ে থাকে। মিথ্যার বিরোধীতা হয় না। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্য দাবীকারক, তাই আজ তাঁর বিরোধীতা হচ্ছে যেভাবে বিরোধীতা হয়েছিল আমাদের মাওলা ও আকা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর। আর এটাও বলা যায় যে, আহমদীয়া জামাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ প্রথমতঃ এই যে এটি আল্লাহ্র জামাত। দ্বিতীয়তঃ এই যে, আহমদীরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রথম সারির মুসলমান। কারণ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল না হলে তিনি এর মধ্যে 'খিলাফত' সৃষ্টি করতেন না। তৃতীয়তঃ হযরত মির্যা সাহেবের দাবী সত্য। চতুর্থতঃ এই জামাতের দ্বারা ইসলামের বিজয় হবে। আর এভাবে আহমদী ভাইয়েরা ইসলামের জন্য জান, মাল সবকিছু আল্লাহ্র খাতিরে ব্যয় (কুরবানী) করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের ও নৈকট্য লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। আলাহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারছি, তাহলো, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) নিজ দাবীতে সত্য। আর না হয় যেখানে আল্লাহ্ নিজে বলেছেন "মিথ্যা রচনা করে কিছু বললে জীবন-শিরা কেটে দিবেন।" (সূরা হাক্কা-৪৫-৪৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই দিনের পর দিন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাত দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি তিনি মিথ্যা হতেন তাহলে তো তাঁর জীবদ্দশাতেই এই জামাতকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতেন, তা নয় কি?

আলোচনার শেষে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর লিখনি থেকে সামান্য কিছু আলোকপাত করতে চাই। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন ঃ *"আমাকে অস্বীকার করা বস্তুত আমাকে নয়, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-কে অস্বীকার করা হবে। কারণ, যে আমাকে 'মিথ্যা' সাব্যস্ত করে, সে আমার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলাকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে।"* তিনি আরো বলেন ঃ *"আমি দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বলছি যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্র রহমতে এ ময়দানে আমারই বিজয় হবে। আমি দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীকে আমার পদতলে দেখছি। সেই সময় অতি সন্নিকট, যখন আমি একটি মহান বিজয় লাভ করব। কেননা আমার কথার সমর্থনে আরও একজন কথা বলছেন। আমার হাতকে শক্তিশালী করবার জন্য আরও একটি হাত কাজ করে চলছে। পৃথিবী তা অনুভব করছে না। কিন্তু আমি তা প্রত্যক্ষ করছি। আমার অভ্যন্তরে এক ঐশী শক্তি কথা বলছে। যা আমার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অক্ষরে নব জীবন সঞ্চার করছে। আকাশে এমন আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে যা এক মাটির ঢেলাকে আল্লাহ্র আদেশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে"।* (রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪০৩)।

মহান খোদা তাআলা পথহারা লোকদের হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সত্যতা বুঝবার ও তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন এবং ২৩শে মার্চের গুরুত্ব সবাইকে উপলব্ধি করার আর সেই সাথে বেশি বেশি দোয়া করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করুন, আমীন!

মাহমুদ আহমদ সুমন (মোয়াল্লেম)

সুন্দরবনে আহমদীয়াত

এক ঐশীবাণী পূর্ণতার জ্বাজ্জল্যমান নিদর্শন,

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ইলহাম পেয়েছিলেন। "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছে দেব"। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন সেই ইলহামের এক চাক্ষুস প্রমাণ। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার এক নিভৃত গ্রাম কাদিয়ান। সেখানে জন্ম গ্রহণকারী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ:) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত ঐশী বাণীতে বিভুষিত করেন। হাজার মাইলের অধিক দুরত্ব সুন্দরবন থেকে কাদিয়ানের। বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন যতীন্দ্রনগর গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের অবস্থান। পৃথিবীখ্যাত একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের পাশ ঘেষেই গ্রামটি ১৯০৮ সালে সুন্দরবনের গাছ-পালা কেটেই সৃষ্টি। বৃটিশ সরকারের জমিদারী ব্যবস্থাপনায় অত্র গ্রামটি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর তালুক ভুক্ত হওয়ায় গ্রামটির নাম যতীন্দ্রনগর রাখা হয়। গ্রামটির আরো একটি ঐতিহাসিক অবস্থান আছে। সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে বাংলার বার ভুঁইয়ার দক্ষিন অঞ্চলীয় শক্তিধর ভুঁইয়া যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাট এই যতীন্দ্র নগর গ্রামের উত্তরের সীমা রেখা সৃষ্টি করেছে। সুমুদ্র উপকুলবর্তী স্থান হওয়ার কারণে জোয়ার ভাটার প্রভাবে প্রাকৃতিক ভাবে এখানে বনের সৃষ্টি হয়। তদকালীন রাজার তৈরি বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন জঙ্গল কেটে আবিস্কৃত হয়েছে এবং এখনো অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে। প্রতি বছর হাজার হাজার ভ্রমন পিয়াসী সুন্দরবন দেখার সাথে সেই সব ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ দেখে কয়েক শতাব্দীর হারিয়ে যাওয়া কালকে স্মরনে আনে।

যতীন্দ্রনগর গ্রামের বাসিন্দাদের পূর্ব পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে এসে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন শুরু করেন। ইংরেজ রাজত্ব কালে কোলকাতা নিকটতম বিধায় এই এলাকার সকল যোগাযোগ ছিল কোলকাতার সঙ্গে। ভৌগলিক অবস্থানে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রান্ত সীমায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের অবস্থিতি। নতুন এলাকা, লবনাক্ত এলাকা। সুপেয় পানির অভাবে প্রতি বছর পানি জনিত রোগে বহু মানুষ মারা যেত এক প্রকার বিনা চিকিৎসায়। কোন রাস্তা ঘাট ছিল না। ছোট খাটো ২/১ টা পাঠশালা ছাড়া শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বৃক্ষ শুন্য জনপদে বসবাসকারী হাতে গোনা কিছু লোকের, পার্শ্বে অবস্থিত সুন্দরবনের কাঠ, মধু, গোলপাতা আহরনে জীবিকা নির্বাহ হত। সে কারণে প্রতি বছর প্রতি পরিবারের কেউ না কেউ বাঘের পেটে যেত। এক কথায় নূন্যতম সামাজিক জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন উপকরন এসব কিছুই এলাকায় ছিল না। তবে কিছু না থাকলেও এলাকার মানুষ গুলো ছিল অত্যন্ত সহজ সরল ধর্মভীরু। ক্ষয়ীষ্ণু জমিদারী ব্যবস্থার প্রান্ত সীমায় এসে মরহুম সামছুর রহমান টি, কে এলাকায় প্রথম ফুড কমিটির সেক্রেটারী, পরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং সবশেষে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। তাঁর সেবা মুলক নের্তৃত্বে গড়ে ওঠে রাস্তা ঘাট, বড় বড় দুই নদীতে বাঁধ দিয়ে জমি উদ্ধার, স্লুইজ গেট, খাওয়ার পানির দীঘি, কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাই স্কুল আরো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অবকাঠামো । হাই স্কুলটি তৈরির সময় নিজের নাম ব্যবহার না করে তিনি লোকালয়ের অবস্থানের নামে স্কুলটির নাম সুন্দরবন উচ্চ বিদ্যালয় রাখেন। সেটি তৈরি হয় ১৯৪৫ সালে । তখন সুন্দরবনের নামে কোন কিছুর নাম রাখার রেওয়াজ চালু হয়নি। বহু দূর থেকে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটতো। তারা সুন্দরবনের নাম ব্যবহার করতে করতে এখন যতীন্দ্রনগর হারাতে বসেছে সুন্দরবনের নামের অন্তরালে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের নাম করন অনেকটা ঐ ধাঁচেই। বর্তমান সাতক্ষীরা তথা যতীন্দ্রনগর জনপদের সৃষ্টি, অবস্থান,সামাজিক অবস্থা ভৌতকাঠামো ইত্যাদি যৎকিঞ্চিত জানা হলো। এখন বিস্ময়কর বিষয় সুদূর পাঞ্জাব থেকে আহমদীয়াতের বীজ কিভাবে রোপিত হলো বাংলাদেশের এই প্রান্ত সীমায়। বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ থানা ১৯৪৩ সালে খুলনা জেলার এক সার্কেল হিসাবে গন্য হতো। আর বর্তমানের মুন্সিগঞ্জ, রমজান নগর, ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নগুলো একটি ইউনিয়ন তথা একটি ইউনিয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত ছিল। এই ইউনিয়ন বোর্ডের ফুড কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন মরহুম সামছুর রহমান টি, কে। তাঁর ঐপদে অভিষিক্ত ছিলেন এখানকার জমিদার বংশজাত স্নাতক পাশ বাবু অবিনাশ চন্দ্র নামক জনৈক যুবক । তার কাজের স্বচ্ছতা না

থাকায় এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে এবং সামছুর রহমানের সততা, সাধুতা ও সেবার মনোবৃত্তি দেখে জনৈক সার্কেল অফিসার হিসাবে নিয়োজিত মির্জা আলী আখন্দ সাহেব তাঁকে ফুড কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে মনোনীত করেন। তখনকার দিনে এক জন হিন্দু জমিদার বংশের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে বিত্তহীন শিক্ষাহীন এক মুসলমান যুবকের কাছে সমর্পন করা এবং এর জন্য উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলার দায়িত্ব নিজ কাঁধে গ্রহন করতে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই পারেন, যার উপর আল্লাহর অপরিসীম ভরসা থাকে। আখন্দ সাহেব যে আহমদী এ পরিচয় তিনি কাউকে দিতেন না। তবে তার চাল চলন, ইবাদতে সামছুর রহমান মুগ্ধ হয়ে এক দিন তার পীরের খবর নিতে যেয়ে আহমদীয়াতের সংবাদ পান। তখনকার দিনে লাহোর থেকে "THE LIGHT" পত্রিকা বের হতো। তিনি সামছুর রহমানকে তার গ্রাহক করে দেন। সংগে আহমদীয়াতের কিছু প্রচার পত্র, বুকলেট ইত্যাদি দেন। ইতোমধ্যে আখন্দ সাহেব বদলী হয়ে অন্যত্র চলে যান। এর কিছু দিন পর ভেটখালী গ্রামের সূফী ছকিমুদ্দিন সাহেব নারায়ণগঞ্জের আহছান উল্লাহ্ সিকদারের সম্পাদনায় স্বল্পকলেবরে বের হওয়া মাসিক "আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক হয়ে গুরু-শিষ্য আহমদীয়াত চর্চা করতে থাকেন। গুরু-শিষ্য এই কারণে বললাম সামছুর রহমান সাহেব ছকিমুদ্দীন সাহেবকে ওস্তাদজী বলে ডাকতেন। সামছুর রহমান সাহেব উর্দ্দু জানতেন না। ছকিমুদ্দীন সাহেব তাঁকে বাংলা করে দিতেন। পরে অবশ্য উর্দ্দূ শিখে সামছুর রহমান সাহেব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত দৈনিক "আলফজল" আর দেশ বিভাগের পরে ভারত থেকে প্রকাশিত দৈনিক "আল বদর" পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। পড়া-শুনার মাঝে আহমদীয়াত সম্পর্কে গভীর প্রত্যয় জন্মালে তিনি ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাবওয়ায় (পাকিস্তান) অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) এর হাতে বয়'আত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সালানা জলসায় সুন্দরবনের আরো কয়েকজন বুযুর্গ আহমদীয়াতের বয়'আত গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে সামছুর রহমান সাহেব বৃহত্তর যশোর খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলা থেকে জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ স্বর্ণপদক সহ টি,কে (তমগায়ে খেদমত) টাইটেল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত হওয়ায় পুরো জেলায় তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তাঁর সততা ও ধর্মভীরুতার প্রতি পূর্ণ আস্থায় আর অনেকেই দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের আশায় গ্রামের কয়েকটি পরিবার ছাড়া অন্যরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, গ্রামের একমাত্র মসজিদটির অধিকাংশ মুসল্লি আহমদীয়াত গ্রহণ করায় মসজিদটি আহমদীদের হয়ে যায়। অন্যরা আলাদা মসজিদ তৈরী করে নেন। তিনি আমৃত্যু সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জাগতিক সুবিধাদি পাওয়ার আশায় বয়'আত গ্রহণকারীগণ কিছু দিন পরে পুরানো ধারার সাথে মিশে যায়। তাতে একটা সুবিধা হয়, আহমদীয়াত সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট সুস্পষ্ট ধারণা থাকায় তারা কখনো আহমদীয়াতের বিরোধিতায় আসতো না। অবশ্য দুরের মোল্যা মৌলবীদের দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক বিরোধীতা হয়েছে। তবে স্মরণযোগ্য বিরোধিতা সংঘটিত হয় ২০০৫ সালে ১৭ এপ্রিল জনৈক মুফতি মাওলানা নূর হোসেন নূরানীর নের্তৃত্বে। দিনটি ছিল সুন্দরবন জামাতের জন্য এক মহাপ্রলয়ের দিন স্বরূপ। দেশের অন্যান্য স্থানে তাদের কর্মসূচী পালন করার পরে গ্রামের জামাত সুন্দরবনের দিকে তাদের কুনজর পড়ে। দুই মাস ধরে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শুধু সাইনবোর্ড পরিবর্তন নয়, মসজিদ কমপ্লেক্সকে গুড়িয়ে দেয়া ছিল তাদের লক্ষ্য। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ত্রিশ/পঁয়ত্রিশ হাজার তাদের ক্যাডার বাহিনী নিয়ে ঐ দিন তারা আক্রমণে আসে। তারা মসজিদ ও কমপ্লেক্স এর কোন ক্ষতি সাধন করতে না পেরে আশে পাশের আহমদীদের বাড়ীতে চালায় লুট-পাট ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। তাদের সে আক্রমণে নারী শিশুও রেহাই পায়নি। আকাশে বাতাসে সেদিন ছিল আহমদীদের বেদনা ভারাক্রান্ত ভারী বাতাস। মহান আল্লাহ্ তাআলা সে দিন নিজের রহিমিয়তের চাদর আহমদীদের জন্য পেতে দিয়েছিলেন। ফলে কমপ্লেক্সের একটি গাছের পাতাও নষ্ট করতে তারা সক্ষম হয়নি। এই ঘটনার পরের দিন থেকে চলে বিভিন্ন হালকায় আহমদীদের বাড়ীতে লুট-পাট ও শারীরিক নির্যাতন। মহান আল্লাহ্ তাআলা বিরোধিতার আগুনের কুন্ডকে ফুল বাগানে রূপান্তরিত করেন। শত শত সত্য অন্বেষী হৃদয় আহমদীয়াতকে জানতে এসে, জেনে শুনে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাত ভুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। শত শত পুস্তক বিতরণ করে, বাৎসরিক জলসা করে বিগত বছরগুলিতে সুন্দরবন জামাত যা করতে পারেনি, এই সকল ঘটনার কারণে আহমদীয়াত প্রচারে শত গুণ সুফল আল্লাহ্ দিয়েছেন। শুধুমাত্র একা সামছুর রহমান জামাতকে এতদুর এগিয়ে নিয়ে আসতে পারেননি। আরও তার সমসাময়িক বুযুর্গ যার অধিকাংশই আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই, এক শিশা গলিত প্রাচীরের মতো তার পাশে থেকে

জামাতের উন্নয়নকল্পে সাহায্য করে গেছেন। আল্লাহ্ তাদের সকলকে বেহেশতবাসী করুন। আরো যারা বিগত দিনে জামাতকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মরহুম মাওলানা মুহিবুল্যাহ (সদর মুরব্বী), মরহুম মৌলবী ছলিমুল্যাহ (মোয়াল্লেম), শহীদ ওসমান গনি, মোয়াল্লেম মরহুম নূর উদ্দীন আফ্রাদ, মোয়াল্লেম মরহুম ফকির ইয়াকুব আলী, মোয়াল্লেম ইস্রাঈল দেওয়ান, মোয়াল্লেম আবুল কাশেম আনছারী, সদর মুরব্বী মাওলানা ফারুক আহমদ, মোয়াল্লেম ইসমাইল হোসেন বোখারী প্রমুখ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়–

"কোন কালে একা হয়নি জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী"

পুরুষের পাশাপাশি সুন্দরবনের লাজনার মা বোনেরা প্রাথমিক পর্যায় থেকে সন্তানের তালিম তরবিয়তের সাথে সাথে সকল উন্নয়ন কাজে অর্থ সহ নিজেদের প্রিয় গহনা পর্যন্ত অকাতরে জামাতকে দিয়ে এসেছেন। নিজেদের সন্তান, ভাই, স্বামীকে শহীদ হতে, আহত হতে দেখেও তারা আপনজনদের শান্ত্বনা যুগিয়েছেন। ওসীয়্যতকারীদের প্রায় অর্ধেক মহিলা। অনেকেই বিয়ের মোহরানা বাবদ প্রাপ্য জমিটুকু জামাতকে দান করে দিয়েছেন। ১৭ এপ্রিল ২০০৫ তারিখে ভাইদের পাশা পাশি বোনেরাও আবেদন জানিয়েছিলেন মসজিদ রক্ষায় তাদের অংশ নেওয়ার জন্য। স্থানীয় জামাত তাদের সে আবেদনে সাড়া না দিলেও আল্লাহ্ ঐদিন স্বগৃহে তাদের রক্ত গ্রহণ করে ছিলেন। মসজিদ কমপ্লেক্সে অবস্থানকারী কোন পুরুষের রক্ত সেদিন ঝরেনি। আল্লাহ্ তাআলা মা বোনের সেই রক্তের বিনিময়ে তাঁদের সন্তান সন্ততিদেরকে জামাতের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করুন।

১৯৬৭ সাল থেকে বিভিন্ন কারণে কয়েক বছর বাদ দিয়ে এখানে নিয়মিত সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ভিন্নধর্মী জলসা। মাগরেবের কিছু আগ থেকে জলসা শুরু হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত জলসার কার্যক্রম চলে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি বছর স্থানীয় জলসার খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন করতেন তিন জনে। (১) মরহুম সামছুর রহমান টি,কে (২) মরহুম সামাদ আলী গাজী (৩) মরহুম সৈয়দ আলী সরদার। পরে কেন্দ্রীয় জলসার চাঁদার সমপরিমাণ চাঁদা স্থানীয় জলসার চাঁদা হিসাবে ধার্য হয়ে আসছে। জামাতের বিভিন্ন অংগ সংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহ্, খোদ্দামুল আহমদীয়া, মজলিসে আনসারুল্লাহ্ উপর্যোপরি ১০/১২ বছর ব্যাপী সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে উত্তম মজলিস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানকার এক অংশ যারা খুলনা শহরে চাকুরী, ব্যবসা ও পড়া শুনার উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন, তাদের জামাত খুলনাও প্রায়শঃ উত্তমের স্বীকৃতিতে বিভুষিত হয়ে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের প্রাণপ্রিয় চতুর্থ খলীফা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বস্ত্রীক দুই দিনের জন্য সুন্দরবন জামাত পরিদর্শনে আসেন, তদানিন্তন পাক বে কোম্পানীর স্পেশাল লঞ্চে। তখন তিনি ছিলেন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের মোহতারম সদর। বিকল্প কোন প্রকার যানবাহন সে সময় না থাকায় হরিনগর বাজার থেকে ৪/৫ কিঃ মিঃ পায়ে হেটে আসেন। নিকটবর্তী কয়েকটি হালকা ছাড়াও ম্যানগ্রোভ সুন্দর বন পরিদর্শন করেন। এছাড়া বহু আহমদী বুযুর্গের পদধূলি পড়েছে এই বিরল জনপদে। তাদের দোয়ার ফসল এই জামাতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি।

১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর জুমার নামাযে খুলনাস্থ আহমদীয়া মসজিদে খুতবা চলাকালীন ১-৩৫ মিনিটে বোমা বিস্ফোরনে শহীদ সাত জনের ছয় জনই সুন্দরবনের। (১) ডাঃ আব্দুল মাজেদ (২) জি, এম, নুরুদ্দীন, (৩) জি, এম, মুহিবুল্লাহ্ (৪) জি, এম, জাহাঙ্গীর (৫) আব্দুস সোবহান মোড়ল (৬) জি, এম, মমতাজ উদ্দীন বাকি একজন আকবর হোসেন পাইক গাছা এলাকার বাসিন্দা। আহতদের অধিকাংশই ছিল সুন্দরবনের। নুরুদ্দীন ও জাহাঙ্গীর মসজিদের মাঝেই শহীদ হন। পরে মুহিবুল্লাহ্ ও সোবহান মোড়ল শহীদ হন। ডাঃ মাজেদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে শহীদ হন। রাত ১০-০০টার দিকে আকবর হোসেন শহীদ হন হাসপাতালে। কয়েক দিন পরে মমতাজ উদ্দিন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় শহীদ হন। বি,বি,সি, ভয়েস অব আমেরিকা থেকে সংবাদ শুনে সুন্দরবনের আহমদী ভাইয়েরা ঐ রাত্রিতেই খুলনায় চলে যায়। খুলনার প্রায় সকল আহমদী আহত। সুন্দরবন থেকে ঐ মুহূর্তে না গেলে আরো অনেক ক্ষতির আশংকা ছিল। মাওলানা ইমদাদুর রহমান সদর মুরব্বী, ওমর ফারুক, শেখ আব্দুল ওয়াদুদ মোয়াল্লেম, আব্দুর রাজ্জাক চঞ্চল, এনামুল হক রনি মোয়াল্লেম, হাফেজ মনসুর আহমদ এদের অবস্থা আশংকা জনক থাকায় চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান হয়। বাকি আলি আকবর, নুরুল্লাহ, জামিল আরো অনেকেরই খুলনাতেই চিকিৎসা করানো হয়। সমগ্র বিশ্বে মিডিয়া ও সংবাদ পত্রে এই ঘটনার

তীব্র নিন্দা জানান হয়। হুযূর (রাহেঃ) সুন্দরবনকে "রত্ন গর্ভা" সুন্দরবন বলে আখ্যায়িত করেন। সাত শহীদের বিনিময়ে সুন্দরবন ও খুলনা জামাত পেয়েছিল আমারতের মর্যাদা। সুন্দরবন জামাতের নিজস্ব কবর স্থানে শহীদগণ সমাহিত আছেন। এই শহীদগণ সুন্দরবন জামাত তথা বাংলাদেশের গর্ব। তারা সার্বক্ষণিক জামাতের আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

নতুন প্রজন্মকে তালিম তরবিয়ত দিয়ে এগিয়ে নিতে পারলেই এই জামাত তার আধ্যাত্মিক উন্নতিকে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। ইনশাআল্লাহ। ইহলৌকিক মঙ্গলেও আল্লাহ্ তাআলা এই জামাতকে পিছিয়ে রাখেননি। সুন্দরবনের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনে সহায়তা দিয়েছে, নিঃসন্দেহে। একমাত্র আহমদীয়াতের কারণে যে ত্বরিৎ উন্নয়ন সম্ভব, তার প্রমাণ এই গন্ড গ্রাম যতীন্দ্রনগর। এখানে আছে, জামাতের নিজস্ব ৬০ শতক জামির উপর গাছপালা পরিবেষ্টিত ছায়ায় ঘেরা কবর স্থান, শহীদগণ যেখানে চির নিদ্রায় শায়িত। পাঠাগার, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, যেখানে প্রতিদিন বহু দূর থেকে আগমণকারী শত শত রোগী উত্তম চিকিৎসা পেয়ে আসছে। খলীফা রাবে (রাহেঃ) এর অর্থানুকুল্যে নির্মিত সুন্দর দ্বিতল গেষ্ট হাউস, মোয়াল্লেম কোয়ার্টার, স্থানীয় ব্যয়ে তৈরী ওজু ও গোছলের জন্য সান বাঁধানো ঘাটে-র পুকুর, খেলা-ধূলা ও জলসার জন্য বিস্তীর্ণ ময়দান, সৌর ও জেনারেটর চালিত বিদ্যুত ব্যবস্থাধীন কম্পিউটার ও এম,টি,এ, ইত্যাদি। আহমদীয়া কমপ্লেক্সের পার্শ্বেই সরকারী দ্বিতল ইমারতের প্রাইমারী স্কুল, দ্বিতল ভবনের আধাসরকারী বহুমুখি হাই স্কুল, ডাকঘর, সরকারী ক্লিনিক, বাজার, পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ ইত্যাদি থাকাতে জাগতিক শিক্ষা দীক্ষা ও সামাজিক সুবিধা গ্রহণের প্রভূত সুযোগ বিদ্যমান। এক কথায় আধুনিক জীবন যাত্রার উপযোগী মোটামুটি ব্যবস্থা আল্লাহ্ তাআলা এই গ্রামকে করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

সুন্দরবন জামাত শুধু মাত্র সাতক্ষীরা অঞ্চলের জন্য নয়। বরং বাংলাদেশের জন্যে এক নার্সারী স্বরূপ। এখান থেকে আতফাল আর খোদ্দাম হয়ে গড়ে উঠা অসংখ্য যুবক বাংলাদেশ জামাতের কেন্দ্রীয় জামাত সহ বিভিন্ন জামাতে এমনকি কাদিয়ানসহ পৃথিবীর অনেক দেশে গুরুত্বপূর্ণ জামাতি দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আলহামদু লিল্লাহ!

সুন্দরবনের (যতীন্দ্রনগর) গ্রামের আশে পাশেই অনেক গ্রাম আছে কিন্তু সামাজিকভাবে তারা অনগ্রসর। সুন্দরবনের আহমদীরা যে ধনী পরিবার থেকে এসেছেন তা নয়। সুন্দরবন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সামছুর রহমান এক অজ্ঞাত, অখ্যাত গরীব পরিবারের সদস্য ছিলেন। এক কথায় প্রাথমিক পর্যায়ে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করে ছিলেন, হাতে গোনা দুই একজনকে বাদ দিয়ে আর সবাই ছিলেন গরীব। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় যত বেশী দিতে পেরেছেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ফেরৎ দিয়েছেন বহুগুণ বেশী। মরহুম ন্যাশনাল আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব প্রতি বছর সুন্দরবন জামাত পরিদর্শনে নৌকা পথে আসতেন। পথে তিনি তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট সামছুর রহমান সাহেবের কাছে আহমদীদের ঘরবাড়ী ইত্যাদির পরিচয় নিতেন। প্রতিটি গৃহকে অতি দারিদ্র সীমার নীচে দেখেতে পেয়ে তিনি মরহুম প্রেসিডেন্ট সাহেবকে উপদেশ দেন **"এদের অভাবে জর্জরিত ও দরিদ্র করে রাখবেন না। গরীবদেরকে জামাতের চাঁদার তালিকা ভুক্ত করে তা পরিশোধে উৎসাহিত করুন। দেখবেন আল্লাহ্ তাআলা কত দ্রুত এদের আর্থিক উন্নতি প্রদান করেন।"** সেই দুই মরহুম বেঁচে থাকতেই এই উন্নতির সূচনা নিজেরাই দেখে গেছেন আর আমরা আজ তার ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছি, এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তাআলা আরো দেখাবেন। বাংলাদেশের প্রান্তসীমায় আল্লাহ্ তাআলার স্বহস্তে রোপিত আহমদীয়াতের বৃক্ষ এক দিন জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পত্রপল্লবে শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে পুরো দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলকে হযরত ইমমা মাহদী (আঃ) এর পতাকার ছায়া তলে নিয়ে আসবে, ইনশাআল্লাহ্।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন এক দিনে তৈরী হয়নি। এর পিছনে যাদের অবদান ছিল তাদের সিংহভাগ আমাদের ছেড়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন। নতুন প্রজন্ম জানবে না, কারা তাদের এই সুন্দর পথের দিশারী ছিল। যে সমাজে গুণী জনের কদর নেই, সেই সমাজের উন্নতি নেই। কালের অতল গহ্বরে সব কিছু যেমন হারিয়ে যায়, তেমনি যেন সুন্দরবন জামাতের ইতিহাস হারিয়ে না যায় তার দায়িত্ব বর্তমানের মতই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। শুধুমাত্র আহমদীয়াত-কে ভালবাসার কারণে এই এলাকায় অকালে ঝরে গেছে আটটি জীবন। খুলনা, রঘুনাথপুর বাগ, ঘরিলাল জামাত– সুন্দরবন জামাতের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। সেদিন বেশী দূরে নয়, শহীদদের তাজা রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকাকে আহমদীয়াতের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসবেন, ইনশাআল্লাহ্! তারা মেনে নিবে রসূলে পাক (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ মাফিক হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কে। আল্লাহ্ তাই করুন, আমিন!

সুন্দরবন জামাতের ছয় শহীদানের পরিচিতি ঃ

শহীদ ডাঃ এম এ মাজেদ (৪২)

জন্মঃ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন মুন্সিগঞ্জ গ্রামে ১৯৫৭ সালের ২১ জুন। পিতার নাম মেহের আলী গাজী। সুন্দরবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ কালে আহমদীয়াত গ্রহণ। ১৯৭৪ সালে সুন্দরবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সালে খুলনার সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয় থেকে স্টার মার্কস সহ আই, এস, সি পাশ করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গোল্ড মেডেল দেয়। অতঃপর বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস পাশ করে কিছু দিন সরকারী হাসপাতালে চাকুরী করার পর ১৯৮৯ সালে প্রথমে ইরান পরে লন্ডনে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পরে দেশে ফিরে খুলনায় নিজস্ব ক্লিনিক খুলে চিকিৎসা সেবার কাজ শুরু করেন। তিনি এক জন ওসিয়্যতকারী ছিলেন। শহীদ হওয়ার পুর্বে তিনি জামাতের অনেক গুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক জন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তার মৃত্যুতে তাঁর অসংখ্য চিকিৎসা সেবী ব্যাথিত। বিধবা হয়েছেন তাঁর স্ত্রী, এতিম হয়েছে দুই শিশু কন্যা।

শহীদ জি,এম, মুহিবুল্লাহ (৩৫)

জন্মঃ ১৯৬৯ সালের ১৩ আগষ্ট যতীন্দ্রনগর (সুন্দরবন) গ্রাম। পিতাঃ জি, এম, মতিয়ার রহমান, মাতা- রিজিয়া খাতুন। ১৯৯২ সালে তিনি লন্ডন আন্তর্জাতিক জলসায় যোগদান করেন। দেশে ফিরে জামাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশেষতঃ খোদ্দামের সংগঠনের দায়িত্বে থাকা কালিন সময়ে শহীদ হন। পিছনে ফেলে গেছেন বৃদ্ধ পিতা মাতা,বিধবা স্ত্রী, এতিম হয়েছে তার তিন বছরের এক শিশু কন্যা।

শহীদ নূর উদ্দীন আহমদ (৩০)

জন্মঃ ১৯৭০ সালের ২৪অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন ভেটখালী গ্রামে। পিতার নাম সেকেন্দার হায়াত, মাতার নাম মনোয়ারা বেগম। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতা মাতার বড় সন্তান। তার অকাল মৃত্যুতে তার পিতা মাতার জীবনে নেমে এসেছে অকাল বার্ধক্যের ছাপ।

শহীদ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (২৪)

জন্মঃ ১৯৭৫ নভেম্বর খুলনা জেলার কয়রা থানার দেয়াড়ি নামক গ্রামে। পিতা আকবর হোসেন গাজী, মাতা শাহীদা বেগম। তিনি ছোটবেলা থেকে সুন্দরবনে তার নানা মরহুম সৈয়দ আলী সরদারের বাড়ীতে থেকে সুন্দরবন হাই স্কুলে পড়তেন। শহীদ হওয়ার পূর্বে তিনি বি,কম পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি একজন উত্তম দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন।

শহীদ সোবহান মোড়ল (৬৫)

জন্মঃ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানাধীন যতীন্দ্রনগর গ্রামে। মরহুম অল্প লেখাপড়া জানলেও উত্তম দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন। তার তবলীগে বহু ব্যক্তি আহমদী হওয়ায় সাতক্ষীরা অঞ্চলের খেলারডাঙ্গা ও ঝাউডাঙ্গায় সুন্দরবন জামাতের পৃথক দুইটি হালকার সৃষ্টি হয় এবং সেখানে রয়েছে দুইটি পৃথক মসজিদ। খেলারডাঙ্গার মসজিদটি ২০০১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঈদের দিনে বিরুদ্ধবাদীরা ভেঙ্গে ফেলে। এই তবলীগের কাজে তিনি অনেক বার বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা প্রহৃত হন। তার দানকৃত জমিতে বড়ভেটখালী হালকার "বায়তুস সোবহান" জামে মসজিদ তার নাম বহন করে চলবে অনাদিকাল।

শহীদ মমতাজ উদ্দীন (৫৫)

জন্মঃ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার অন্তর্গত হরিনগর গ্রামে। তিনি আহমদীয়া মসজিদ খুলনায় মুয়াজ্জিন এবং দাতব্য হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক ছিলেন। এছাড়াও তিনি এক সময় বাংলাদেশ জামাতের কেন্দ্রেও খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৮ অক্টোবর বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়ে ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৯ ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।**

মোহাম্মদ আবু কাওসার

সাবেক আমীর,

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

খেলাফত সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

৩১শে, ২০০৭ প্রকাশিতব্য **'পাক্ষিক আহমদী'**-র সংখ্যাটি **'খেলাফত সংখ্যা'** হিসেবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ্! এ সংখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্গণের জীবনী ও খেলাফত কালের তাৎপর্যবহ বিষয়াদির উপর লিখা আহ্বান করা হচ্ছে।

–সম্পাদক

আগামী বিশ্বের আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নেযামে ওসীয়্যত

'ওসীয়্যত' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ উপদেশ - প্রবল ও ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রকাশ। যে উপদেশ জোর দিয়ে বুঝানো হয় এবং উপদেশকারী মনে করে যে, যাদের কাছে তার এ ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তারা অবশ্যই এ ইচ্ছাটি পূরন করবে।

'ওসীয়ত' শব্দটি বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে প্রায় সবার কাছেই পরিচিত ও প্রচলিত। মৃত্যুকাল উপস্থিত হলেই অর্থাৎ একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ তার ঘনিষ্ঠ ও নিকট আত্মীয়স্বজনকে ডেকে তার সহায় সম্পত্তি প্রিয়জনকে দেয়ার ইচ্ছা–যা' শেষ ইচ্ছা, ঐকান্তিক ইচ্ছা–তা প্রকাশ করে।

পবিত্র কালাম কুরআন মজীদে বলা হয়েছে– কুতিবা আলাইকুম ্যা হাদারা আহাদুকুম মাওতু ইন্ তারাকা খাইরানিল ওসিয়াতু লিল্ ওয়ালিদাইনী ওয়াল আকরাবীনা বিল্ মারুফে, হাক্কান আলাল মুত্তাকীন। (সূরা বাকারা: আয়াত-১৮১)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হলো যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো মুত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধনসম্পত্তি ছেড়ে যায়, তাহলে সে পিতা মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনকে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করার ওসীয়ত করে যাবে, যা মুত্তাকীগণের উপর অবশ্য কর্তব্য।

খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক পৃথিবীতে তৌহিদ ও সুন্নাহর পূন:প্রতিষ্ঠার জন্য এ যুগে ও উম্মতে আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহদী (আ:) তাঁর জীবনের শেষ অংশে রচিত 'আল্-ওসীয়ত' পুস্তিকাতে লিখেন, খোদা পূন: পূন: ওহী মারফত আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার মুত্যুকাল নিকটবর্তী। এ কথা নিশ্চিত হয়ে তিনি এ পুস্তিকাতে লিখেছেন যে, "আমি একজন ফেরেশ্তাকে দেখেছি.....সে এ জায়গায় পৌঁছে আমাকে বল্ল এটি তোমার কবরের স্থান.....তোমার কবর। আরো একটা জায়গা দেখানো হলো এবং তার নাম রাখা হয়েছে 'বেহেশতী মাকবেরা' এবং বলা হয়েছে যে, এটি জামাতের সে সব মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্র যারা বেহেশ্তী। এ জন্য আমি আমার নিজস্ব জমি এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছি এবং দোয়া করছি যে, খোদা যেন এতে বরকত দান করেন এবং এটিকেই 'বেহেশতী মাকবেরা'তে পরিণত করেন। জামাতের সেসব পবিত্র আত্মা বুযুর্গদের যেন এটি নিদ্রাস্থান হয়, যারা প্রকৃতভাবেই ধর্মকে দুনিয়ার সব কিছুর উপর প্রাধান্য দান করে খোদার হয়ে গেছেন" (আল ওসীয়ত-বাংলা অনুবাদ পুন: মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ৯১ পৃ: ৩১, ৩২) তিনি আরো লিখেন–''.....আমি এ সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুসংবাদ পেয়েছি এবং খোদা এটিকে শুধু 'বেহেশ্তী মাকবেরা'ই বলেননি বরং এও বলেছেন যে, 'উনযেলা ফীহা কুল্লু রাহ্মাতিন'-অর্থাৎ সকল অনুগ্রহরাজি এতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (আল ওসীয়ত-পৃ: ৩৪)

হযরত ইমাম মাহদী (আ:) আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে বার বার তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তিনি এ ওসীয়তের ঘোষণা করেন এবং তাঁর রচিত 'আল্ ওসীয়ত' পুস্তিকায় তাঁর অনুসারীদের জন্য যে দু'টি স্থায়ী ব্যবস্থার কথা বলে গেছেন– তার প্রথমটা দ্বিতীয় কুদরত (কুদরতে সানীয়া) (দ্বিতীয় কুদরত) আর অপরটি ওসীয়ত ব্যবস্থা। এ দ্বিতীয় কুদরতের পঞ্চম বিকাশ-খেলাফতে খামেসা, আর এ পদে বর্তমানে রয়েছেন সৈয়দেনা হযরত মীর্জা মাসরূর আহমদ (আই:) যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত আহমদীয়া জামাতের প্রধান এবং খলীফা, মানুষের জন্য ধর্মীয় নেতা। যার অনুবর্তিতায় হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর আদর্শ অনুসারীতে উন্নীত করে। তাঁর নির্দেশনা বান্দাকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সুযোগ করে দেয়। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে ওমর (রা:) হতে বর্ণিত হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন– যে মুসলমানের অসিয়ত করার মত কিছু থাকে, তার অসিয়ত না লিখে দু'রাতও কাটানো জায়েয নয়।–বুখারী, মুসলিম।

খেলাফত ও ওসীয়ত-এ দু'টি ব্যবস্থা ধর্মীয় ও জাগতিক মহাকল্যাণের চাবিকাঠি। জন্মিলে মরতে হবে –এ বিশ্বাস, মুহাম্মদীয়া নবুয়তের প্রবহমান ধারা, তদ্পরবর্তী খেলাফত, বয়েত, এতায়াত–এ পাঁচটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আহমদীয়া জামাতের ওসীয়ত ব্যবস্থা। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এ এক মহাচ্যালেঞ্জ সারা দুনিয়ার অ-আহমদীদের প্রতি এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি। যার শুরু আছে-তার শেষও আছে। মৃত্যু পরবর্তী নিজ সম্পদের চলমান ব্যবহার এবং একই সাথে ঐশী নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত বেহেশতী মাকবেরায় নিজের স্থান পাবার বিষয়টি অবশ্যই আত্মতৃপ্তির বিষয়।

যে মুসলমান খোদাকে ভয় করে, সে অবশ্যই পৃথিবীতে এমন কর্ম করবে, যা' নিয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে পারবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে আল্লাহ্ রাহমানুর

রাহীম ভবিষ্যদ্বাণী করে সুসংবাদ দিয়েছেন–"ইয়ে বীজ বাড়েগা, আওর ফুলেগা আওর হর এক তরফ সে উসকী শাঁখে নিকলেগী, আওর এক বড়া দরখত হু যায়েগা" অর্থাৎ এ বীজ বর্ধিত হবে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হবে এবং প্রত্যেক দিকে এর শাখা প্রশাখা বের হবে, এবং একটা বিরাট বৃক্ষে পরিণত হবে। পৃথিবীতে পুনঃ খেলাফত কায়েম হবে–পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চলতে থাকবে। এটা ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বানী। এটা পূর্ণ হবেই। এর জন্য প্রয়োজন একটা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নেযামে ওসীয়তের মাধ্যমে। এ ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেক আহমদী নিজের ইচ্ছায় তার সম্পদের কমপক্ষে দশভাগের একভাগ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, ইসলাম প্রচারের জন্য, 'যাদের নেই' (Have nots) –সেসব মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য এ ব্যবস্থার অধীনে রেখে থাকেন। যেমনটি আল্লাহ্ চাহেন, যেমনটির কথা হযরত ইমাম মাহদী (আ:) তাঁর অনুসারীদেরকে বলে গেছেন। এ দান বা ব্যয় আল্লাহ্‌র নির্দেশে, এতে কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জবরদস্তি নেই। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই এ নেযামের অন্তর্ভুক্ত হবে, নিজ নিজ সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যু পরবর্তী সঞ্চয়ের জন্য ব্যয় করবে। এভাবে সঞ্চিত সম্পদে সম্পদের পাহাড় হবে, পৃথিবী দারিদ্রমুক্ত হবে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে ইবাদত বা উদ্দেশ্য এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে। পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য রেখে যাওয়া সম্পদে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র দূরীকরণ হবে। মরনোত্তর চক্ষুদান করে যেমন মানুষ আরেকটা জীবিত মানুষের মধ্যে অনেকদিন বেঁচে থাকে, তেমনই এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত একজন ওসীয়তকারী আহমদীর সম্পদে জীবিকা নির্বাহ হবে বেঁচে থাকা দরিদ্র, অসহায়, অনাথ মিসকীনদের। কি চমৎকার ব্যবস্থাপনা! এখানে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, শুধুমাত্র এভাবে সম্পদ দান করলেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব? না, শুধু সম্পদ দানই নয়, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ:) তাঁর রচিত 'আল ওসীয়ত ' পুস্তিকাতে লিখেছেন- 'খোদাতায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে নিজ বয়াতের দাবীতে সত্যবাদী – কে মিথ্যাবাদী। তিনি (আ:) এ পুস্তিকার শেষাংশে দুটি শর্ত আরোপ করেছেন। এ শর্তের মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত হলো- সমগ্র জামাত থেকে এ কবরস্থানে (কাদিয়ান ও রাবওয়ার বেহেশ্‌তী মাকবেরা) শুধু তিনিই সমাহিত হবেন, যিনি এ ওসীয়ত করবেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/১০ দশমাংশ এ সিলসিলার নির্দেশানুযায়ী ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে এবং প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ, পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর ওসীয়ত এর চেয়েও বেশী লিখে দিতে পারবেন, কিন্তু সম্পত্তির দশমাংশ থেকে কম হবে না। আর তৃতীয় শর্ত হলো, এ কবরস্থানে যারা সমাহিত হবেন, তারা হবেন মুত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম থেকে আত্মরক্ষাকারী, কোন প্রকার শিরক ও বেদাতের কাজ করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন। (আল-ওসীয়্যত পৃ:৩৬-৩৮)

হযরত ইমাম মাহদী (আ:) আরো বলেন, আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি এ জামাতকে উন্নতি দেবেন, অন্য ধর্মালম্বীদের উপর বিজয় দান করবেন। তাই আশা করা যায়, এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের জন্য এত বিপুল অর্থ সমাগম হবে, আর ইসলামের অনুকূলে যত বিষয় থাকবে, যার বিস্তারিত বর্ণনার এখনও সময় আসেনি।

এ যাবত আমি ওসীয়ত কি– এ কথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। তবে এ ব্যবস্থা কেন? এ বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরব– ইনশাআল্লাহ্। এ ঐশী ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে খোদার প্রিয় ব্যক্তিগণের এক আদর্শ, শোষণহীন, স্বেচ্ছা সম্পদদানে পরিপূর্ণ, স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। খোদাপ্রেমিকদের সংজ্ঞা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর পুস্তকায় দিয়ে লিখেছেন–"যো লোগ ইমান লাতে–এয়সা ঈমান, যো ইসকী সাথ দুনিয়া কী মালুনী নেহী, আওর ওহ ঈমান নেফাক ইয়া বুঝদিলী সে আলুদা নেহী, আওর ওহ ঈমান এতায়াত কী কিসি দরযা সে মাহরূম নেহী, এয়সে লোগ- খোদা কী পসন্দজিদা লোগ হ্যায়।" অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে, এরূপ ঈমান যে, তাতে কোন পার্থিব লালসা নেই এবং সে ঈমান–যা কপটতা, মিথ্যা ভীরুতা দুষ্ট নয় এবং অনুবর্তিতার কোন স্তর থেকে বিবর্জিত নয়–এরূপ ব্যক্তিগণ খোদার প্রিয় ব্যক্তি।

ওসীয়ত ব্যবস্থা বুঝাতে এবং এ ব্যবস্থা কায়েম করতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ:) খোদাতায়ালার এক বিশেষ এলহামের মাধ্যমে ১৯০৫-০৬ সনে 'আল ওসীয়ত' পুস্তিকা লিখে গেছেন। পুস্তিকাটি আজ থেকে ৬৯ বছর আগে (এ দেশে বাংলাভাষার আন্দোলন হওয়ারও সতর বছর আগে) বাংলায় অনুবাদ করে এ দেশে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। 'তাঁর মৃত্যু সন্নিকট' আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে তিনি তা' জেনে এ পুস্তিকাটিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ পুস্তিকাটিতে তাঁর দাবীসমূহের সপক্ষে আসমানী নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তার অসমাপ্ত কার্যাবলী চালু রাখার এক ঐশী প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ করেছেন। সে ব্যবস্থাটি স্থায়ী এবং কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকার ঐশী

ভবিষ্যদ্বাণীর কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। সে ব্যবস্থা দ্বিতীয় কুদরত, খেলাফত আলা মিনহাযে নবুয়ত-যা' এ যুগের খেলাফতে আহমদীয়া। ইনশাআল্লাহ্ আগামী বছর অর্থাৎ ২০০৮ সনে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত (বর্তমানে ইসলামের ত্রিশ কোটি মানুষের জামাত) এ দীর্ঘস্থায়ী খেলাফতের শতবর্ষপূর্তি উৎসব কৃতজ্ঞতার সাথে উদ্‌যাপন করবে-ইনশাআল্লাহ্। এ এক অভূতপূর্ব রহমত, সারা দুনিয়ার মানুষগুলোর জন্য।

ওসীয়ত ব্যবস্থার সাথে মোহাম্মদীয়া নবুয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় খেলাফত, এতায়াত ও একটা স্থায়ী ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের চিত্র আঁকা হয়েছে। আহমদীয়া জামাতের খেলাফতের আজ ৯৯ বছর-এটি একটি স্থায়ী ব্যবস্থা-এ কথা বুঝাতে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। একটু আগেই এ ব্যবস্থাপনার সাথে এতায়াত বা আনুগত্যের বিষয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আ:) এর ইলহামের বিষয়টি আমি উল্লেখ করেছি। কুরআন মজীদে এতায়াতের ব্যাপারে যেমন তাগিদ রয়েছে, তেমনি এ ব্যবস্থাপনার সাথেও এতায়াত বা অনুবর্তিতা সম্পৃক্ত।

হযরত ইমাম মাহদীকে (আ:) মানার ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর তাকিদ রয়েছে। এ মানা যে কত কঠিন, আহমদী মাত্রই তা জনেন। তাঁকে মানতে হলে বয়েত করতে হয়। এ বয়েতের আছে দশটি শর্ত। আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্য (নারী পুরুষ নির্বিশেষে) জানেন যে, বয়েত মানেই নিজকে বিকিয়ে দেয়া আল্লাহ্ প্রাপ্তির জন্য। যার কাছে বিক্রীত, তিনি যা মনে করবেন, বিক্রীত মানুষটাকে তাই করতে হবে। বয়েতের দশম শর্তে রয়েছে- "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এ অধমের (হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে।' আল ওসীয়ত পুস্তিকা রচনা করে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ:) কুরআন মজীদের সূরা আনকবুত এর ২ ও ৩ নং আয়াত উল্লেখ করে বলেন, 'প্রত্যেক যুগেই তিনি (আল্লাহ্) পাপী ও পুণ্যবানদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখাতে চেয়েছেন। ওসীয়ত ব্যবস্থা এ যুগের পরীক্ষা।

ওসীয়ত করাটা এতায়াতের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইমাম মাহদী (আ:) ও তাঁর খলিফাগণকে মানি তবে এখনও ওসীয়্যত করার উপযুক্ত হইনি। এ কথা বলে ওসীয়ত করা থেকে নিজকে দূরে রাখা যাবে না। কেননা, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ:) তার আল-ওসীয়ত পুস্তিকায় লিখেছেন- "এটা খোদাতায়ালার কাজ। খোদাতায়ালা যা' চান, তাই করেন। নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থা দ্বারা তিনি মুনাফিক ও মোমেনের মাঝে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করবেন।" তিনি আরও লিখেন "যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করবেন, তারা অন্যান্য লোকদের থেকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন এবং এটা প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তাঁরা বয়েতের প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন ও নিজ সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য মোনাফেকদের কাছে এ ব্যবস্থা ভারী বলে মনে হবে।" (আল ওসীয়্যত পৃ: ৪৮-৪৯)

'আল ওসীয়ত' পুস্তিকায় তিনি আরও লিখেন, "স্মরণ রাখতে হবে যে, --- খোদাতা'লার অভিপ্রায় এই যে, এরূপ কামেল ঈমানদারগণ যেন একই জায়গায় সমাহিত হন, যাতে ভবিষ্যত বংশধরেরা একই স্থানে তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজেদের ঈমান তাজা করতে পারে।" (ঐ অনুবাদ পৃ:৩৯)

এখন প্রশ্ন হলো-এ ব্যবস্থার অধীনে আসা কি ফরয? ওসীয়ত না করলে কি বেহেশ্‌তে যাওয়া যাবে না? যিনি এ ব্যবস্থার অধীনে আসবেন না- তিনি কি উত্তম আহমদী বলে বিবেচিত হবেন না?

কথায় কথা আসে-তাই এ বিষয়টাও স্বচ্ছ করতে চাই।

হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখে, সব কিছু মিলিয়েই একজন মানুষ কাদিয়ানে জন্মলাভকারী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে এ যুগে ইসলামের সংস্কারক ও দিশারী হিসাবে বিশ্বাস করে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ:) হিসাবে মেনে তার হাতে বয়েত করে। আমার মতে সে মানুষটা যদি ওসীয়ত না করে, তাহলে সে বয়েতের প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করল না। সে প্রকৃতপক্ষে খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিও তার বিশ্বাসকে দৃঢ় করল না। সে কি করে যমানার খলীফার নির্দেশনা থেকে ফল লাভ করবে? অথচ আমরা সবাই জানি ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত স্থায়ী ব্যবস্থা; বর্তমান সময়েই এ খেলাফত শতবর্ষের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। খেলাফত সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বানী তা' পূর্ণতার জন্য সহযোগিতা করাও প্রত্যেকটি আহমদীর কর্তব্য ও দায়িত্ব।

আল্লাহ্ কুরআন মজীদে মুমেনদেরকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও রাতের গভীরে নিজের সুখ নিদ্রা ছেড়ে 'তাহাজ্জুদ' নামায পড়তে বলেছেন। তাহাজ্জুদ কি ফরয? তা' নয়। আমরা আমাদের আকাংখাকে পূর্ণ করার জন্য, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য, পুণ্যের আশায় এ এবাদতটি করি। কেউ কেউ তাহাজ্জুদ পড়ে তৃপ্ততার ঢেকুরও তোলেন। তা'হলে আমরা এতসব জেনেও নেযামে ওসীয়তের আওতায় আসতে সংকোচ বোধ করছি কেন? তার একটাই জবাব আমরা আমাদের ধন-সম্পদকে বেশী ভালবাসি।

আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে আল্লাহর কথা গভীরভাবে চিন্তা করি না। সূরা আল্ ফজ্বরে আল্লাহ এরশাদ করেন–

"তোমরা আসলে এতীমকে সম্মান কর না। এবং মিসকীন্‌কে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না। এবং তোমরা (অন্য লোকের) ওয়ারিশী সম্পদ একত্রিত করে অবাধে ভক্ষণ করে থাক। এবং তোমরা ধনসম্পদ জমানোকে অত্যধিক ভালবাস।"

আল্লাহ্ কুরআন মজীদে সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নং আয়াতে আরো বলেন, তোমরা কখনও পূন্য অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা যা' ভালবাস, তা' থেকে খরচ কর।

আমি এখন স্পষ্ট করতে চাই, কেন একজন আহমদী ওসীয়ত করবে-এ ওসীয়তে সমাজ, দেশ ও জাতি এবং বিশ্বের কি কল্যাণ হবে? ওসীয়ত ব্যবস্থা একটা আন্তর্জাতিক নেযাম। এ ব্যবস্থাটির শুরুতে রয়েছে আল্-ওসীয়ত পুস্তিকা। এতে যে মূল একটা ভবিষ্যদ্বানীর শুভসংবাদ, তা' খেলাফত- যা' ধারাবাহিকভাবে একে একে আমাদের সামনে পাঁচবার পূর্ণতা লাভ করেছে। এ পূর্ণতা শতবর্ষের, এবং এ সিড়ি বেয়েই তা' কেয়ামত পর্যন্ত ব্যপ্ত থাকবে। যারা খেলাফতে বিশ্বাসী, তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তার খোরাক রয়েছে। এ খেলাফতের রজ্জু ধরেই হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণ ও খোদাপ্রাপ্তি সম্ভব।

এ ওসীয়তের নেযাম এক নূতন আকাশ, নূতন যমীন সৃষ্টি করবে। ইসলামের প্রচারের জন্য যে একটা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন, তার প্লাটফরম বা কর্মক্ষেত্র হলো এ ওসীয়ত ব্যবস্থা।

এ দ্বারা স্বেচ্ছপ্রণোদিত সৎ ও সার্থক একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলন। তাই, আল্লাহ্ চান, একজন মুসলমান, যিনি আহমদী মুসলমান, তিনি মাটির নীচে চলে গেলে, তার হাড়গোর মাটিতে মিশে গেলেও তার সম্পদের (যা' কমপক্ষে দশভাগের একভাগ) মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার, এতীম-মিসকীন ও নওমোসলেম এবং যাদের জীবিকা নির্বাহের যথেষ্ট উপায় নেই (Have nots), তাদেরকে সাহায্য করার কাজে ব্যয়িত হবে। আল্লাহ্ কুরআন মজীদে যেমন বলেছেন, "দূর্ভিক্ষ কবলিত দিনে অন্নদান করা, নিকটাত্মীয় এতীমদেরকে ধূলিধূসরিত মিসকিন-দেরকে, তারপর সে এসব লোকের অন্তর্ভূক্ত হয়, যারা ঈমান আনে, এবং সবর করার জন্য, দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ উপদেশ দেয় (সূরা বালাদ:১৫-১৭)। আজকের বিশ্বে যে, Have nots-দের চাহিদা পুরণ করা, বা দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, তার বাস্তব রূপায়নের জন্যই এ স্বত:স্ফূর্ত ওসীয়ত ব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে দরিদ্র দেশগুলোকে ধনী দেশগুলোর ঋণ দিয়ে যে উন্নয়নশীল দেশ করার ব্যবস্থা চলছে –সে ব্যবস্থা আর ওসীয়ত ব্যবস্থা, সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আগামী বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর Have nots-দের জন্য এ অসিয়ত ব্যবস্থা এক আদর্শ, উন্নততর ও শোষণমুক্ত এক সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সাম্প্রতিককালে এক জরীপে দেখা গেছে সারা বিশ্বে প্রতিরাতে আনাহারে থাকে পঁচাশি কোটি মানুষ। যাদের নেই (Have nots), এমন বুভুক্ষু বঞ্চিত মানুষগুলোর একাংশের অভাব পূরণের জন্য আগামী বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে এ স্বেচ্ছাপ্রণেদিত অর্থ ব্যবস্থা। আর এ ব্যবস্থা পরিচালিত হবে খেলাফাতের তত্বাবধানে দিয়ানতাদার, ঈমানদার মুসলমানদের দ্বারা।

ইসলামে দারিদ্র দূরীকরনের জন্য যাকাত ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যবস্থাটির সঠিক ও যথার্থ কার্যকর করার দায়িত্ব নেযামে খেলাফতের। এ খেলাফত ব্যবস্থা আহমদীয়া জামাত ছাড়া অন্যদের মাঝে নেই, কেননা ইসলামের অন্য কোন দলেই খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়নি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত 'যাকাত' ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্র, অনাথ, বিধবা এবং Have nots -দের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা জারী রেখেছে।

আমার মনে হয় স্বল্প কথার মধ্য দিয়েই এ কথা স্পষ্ট যে, ওসীয়ত ব্যবস্থা বিশ্বের কি কল্যাণ করতে পারে এবং আহমদী মুসলমানদের কেন এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ রাহেমুকুল্লাহ তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন–

"এটা লজ্জার ব্যাপার যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত উন্নতি হওয়া সত্বেও ক্ষুধা ও তুষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সবকিছু ঠিকঠাক রাখতে চাইলে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে যে, সে ভিক্ষুক ও গরীবদের তাদের পাওনা যে সম্পদ তা' ফিরিয়ে দেবে, যার প্রকৃত মালিকানা তাদেরই। সুতরাং খাদ্য, বস্ত্র, পানি ও আশ্রয়ের মৌলিক চাহিদাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে সব কিছুর চাইতে।"

অন্য কথায়, একটা সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রে, না থাকবে কোন ভিক্ষুক, না কোন নিঃস মানুষ, যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র,পানি ও আশ্রয়ের কোন অভাব থাকবে না। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান প্রধান হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই:) ২০০৪ সনের ১লা আগষ্ট তারিখে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বার্ষিক জলসার সমাপনী বক্তৃতায় বলেন,

"আমার ইচ্ছা এবং আমি এ ঘোষণা করতে চাই যে, আপনারা আপনাদের নিজের জীবনকে পবিত্র করতে, নিজেদের বংশধরদের জীবনকে পবিত্র করতে এ

ঐশী নিযাম অর্থাৎ ওসীয়তের নিযামে অংশ নিন। এগিয়ে আসুন এবং খেলাফতের শতবর্ষ উদযাপনে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ওসীয়তকারী হউন। ফলে এমন মুমেন বেরিয়ে আসুক, যাতে করে বলা যায়, তাঁরা এ যুগের মসীহ (আ:) এর ডাকে সাড়া দিয়ে 'লাব্বায়েক' বলে কুরবানীর সর্বোচ্চ মানদন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। হুযূর (আইঃ) একই বছরের ১০ই সেপ্টেম্বর, বেলজিয়ামের মসজিদ বায়তুল ইসলামে প্রদত্ত খুতবায় এরশাদ করেন, "আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক মুসলমানকে পুণ্য কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বলেছেন। কেবল পুণ্য কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে নয় বরং পুণ্য কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন। যেখানে মু'মেনদেরকে পুণ্যকর্মে একে অপরের সাথে প্রতিযোগীতার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে অন্যদের তুলনায় যে কোন পুন্যের কাজে পিছিয়ে থাকা বা প্রতিযোগীতার চেষ্টা না করাকে কিভাবে সহ্য করা যেতে পারে? কারণ পুণ্য কর্ম এবং ভাল কাজ করা তো মুমেনদের বৈশিষ্ট্য। এবং এমনই হওয়া চাই, কারণ তারা তো আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সৃষ্টির সেরা। যেমন বলেছেন:

"ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস্ সালিহাতি, উলায়িকা হুম খায়রুল বারিয়া"

অর্থঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্য কর্ম করেছে এরাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।" (সূরা বাইয়্যেনাহ-৯৮:৮)

হুযূর (আই:) আরও বলেন, "যদি আপনারা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করতে এবং সন্তুষ্টি লাভ করতে চান, তাহলে, তাঁর একমাত্র পথ এই যে, পুণ্য কর্মে সামনে এগিয়ে যাবেন। এটাই আল্লাহতায়ালার নির্দেশ।

এটা খুবই খুশীর ব্যাপার যে, বর্তমানে বাংলাদেশে দুই শতাধিক জীবিত মুসী রয়েছেন। এ নেযাম কায়েম হওয়ার পর থেকে এ যাবত কাদিয়ান ও রাবওয়ার বরকত ও আশীসমন্ডিত বেহেশতী মকবেরায় প্রায় অর্ধশত বাংগালী মুসীর স্মৃতিফলক লাগানো হয়েছে।

আমি আপনাদেরকে অনেকবারই মুখে এবং লিখে বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, ওসীয়ত ব্যবস্থা একটা লোভনীয় ও আত্মতৃপ্তিকর ঐশী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার অধীনে আসলে যেমন বয়েতের এবং এতায়াতের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে, তেমনই নিজের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুর পর লাখো মানুষের দোয়া লাভের বিষয়টা নিশ্চিত হওয়া যাবে। আমি এবারেও বলছি- একজন ওসীয়তকারী অবশ্যই নিজের জীবনকে বেহেশতী হিসাবে গড়ে তুলবেন- নিজের কুরবানী, আদর্শ চরিত্র গঠন ও পূণ্যকর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে যেমনটির কথা বলেছেন হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ:) 'আল্ ওসীয়ত' পুস্তিকায় লিখেছেন- 'হে শ্রোতাগণ, শোন! খোদা তোমাদের কাছে কি চান? শুধু এটাই যে, তোমরা খোদার হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, আকাশেও নয়, ভূ-পৃষ্ঠেও নয়। আমাদের খোদা সেই খোদা-যিনি এখনও জীবিত আছেন যেমন পূর্বে জীবিত ছিলেন, এখনও তিনি কথা বলেন, যেমন আগেও কথা বলতেন এবং এখনও তিনি শোনেন, যেমন পূর্বে শোনতেন। (আল্ ওসীয়ত- পৃষ্ঠা-২২)

শেষ করার আগে কিভাবে ওসীয়ত করবেন তা' আজো বলে দিচ্ছি।

হযরত ইমাম মাহদী (আ:) আল্ ওসীয়ত পুস্তিকায় লিখেছেন-

প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি আল্ ওসীয়ত পুস্তিকার শর্তসমূহ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন, তিনি অবশ্যই তার এ স্বীকৃতি অন্তত: দু'জন সাক্ষীর লিখিত সাক্ষ্যসহ সজ্ঞান অবস্থায় আঞ্জুমানের কাছে সমর্পন করবেন এবং স্পষ্টভাবে লিখতে হবে যে, তার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির দশ ভাগের একভাগ আহমদীয়া সেলসেলার উদ্দেশ্যাবলী প্রচারের জন্য ওসীয়ত করছেন এবং এ ঘোষণা অন্তত: দু'টি সংবাদপত্রে অবশ্যই প্রকাশ করবেন। (আল্ ওসীয়ত- পরিশিষ্ট-১, পৃ: ৪৪)

এ বিষয়গুলো মেনে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া যে ওসীয়ত ফর্ম ছেপেছে, যিনি ওসীয়ত করতে চান তিনি এ ফর্ম পুরন করে নিজ ও সাক্ষীর স্বাক্ষরসহ নিজ জামাতের মাধ্যমে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়তের কাছে পাঠাবেন। এ ফর্মের সাথে 'শর্তে আউয়াল' ও 'এলানে ওসীয়ত'-এ দু'টি খাতে নির্ধারিত অর্থ প্রদান করে এর মূল রশিদটি পাঠাবেন।

যিনি ওসীয়ত করবেন, তিনি তার নাম, পিতার নাম, বয়স, কবে বয়েত করেছেন, বর্তমান পেশা, মাসিক আয় এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পুর্ণ বিবরণ লিখে ঢাকায় পাঠালে, বাকী কাজ ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব করবেন।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে আমাদের প্রিয় ইমাম খলিফাতুল মসীহ আল্ খামেস আইয়্যেদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয-এর আহ্বানে 'লাব্বায়েক' বলার তৌফিক দিন।

রাব্বানা ইন্নানা ছামি'না
মুনাদিআঁইইউনাদী লিল্ ঈমানি আন্
আমিনু বিরাব্বিকুম

ফা আমান্না, রাব্বানা ফাগফিরলানা
যুনুবানা ওয়া কাফ্‌ফির আন্না
ছাইয়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা
মা'আল আব্‌রার।

(সূরা আলে ইমরান-১৯৪)

আলহাজ্ব এ. কে. রেজাউল করীম

(আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৩তম সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(দ্বিতীয় কিস্তি)

বরাহীনে আহমদীয়ার প্রকাশনা ঃ

এই সময়ে তিনি (আঃ) ইসলামের সত্যতা প্রমাণে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে দলীল প্রমাণের সাথে মুকাবেলার জন্য খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখেতে শুরু করেন। এ সকল প্রবন্ধের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ইসলামের স্বপক্ষে এমন অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করলেন যা খন্ডন করার ক্ষমতা কারো ছিল না।

খবরের কাগজে কিছু কাল প্রবন্ধ লেখার পর তিনি (আঃ) 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামে এক বই লিখতে আরম্ভ করেন। এ বইতে তিনি (আঃ) ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতার অকাট্য দলিল উপস্থাপন করেন। এই বইয়ের প্রথম খন্ড ১৮৮০, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮১, তৃতীয় খন্ড ১৮৮২ এবং চতুর্থ খন্ড ১৮৮৪ ইং প্রকাশিত হয়। বইটির প্রকাশনার সাথে সাথে সমগ্র ভারত বর্ষে তাঁর (আঃ) সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মৌলভী মোহাম্মদ হোসায়েন বাটালভী যিনি পরবর্তীতে তাঁর ঘোর বিরোধী হন লিখেন "আমার মতে এ যুগে ও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ বইটি এমন এক গ্রন্থ যার দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।" (ইশাআতে সুন্নাহ)।

এ ছিল মুসলমান সমাজের মতামত। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের এ পুস্তকের উত্তর প্রদানের চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্ত্বেও কেউ তা গ্রহণ করেনি ও কারো সাহসও হয়নি। তবে তারা বিরোধিতা বাড়িয়ে দিল এবং বিভিন্ন ভাবে তাঁর (আঃ) ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করলো। সবক্ষেত্রে তারা অসফল হলো।

ডাক বিভাগের মামলা

১৮৮৭ সনে রালিয়ারাম নামক এক খৃষ্টান উকিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে এক মামলা করে। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এটি ডাক বিভাগের মামলা বলে পরিচিত। ঘটনা এরূপ, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইসলামের স্বপক্ষে আর্য্য সমাজীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপানোর উদ্দেশ্যে প্যাকেট আকারে ডাকযোগে অমৃতসরের একটি ছাপাখানায় পাঠান। উক্ত প্যাকেটে তিনি (আঃ) একটি চিঠিও রাখেন। সে যুগে ডাক বিভাগের আইনানুযায়ী প্যাকেটের মধ্যে চিঠি রাখ দন্ডনীয় অপরাধ ছিল, যার শাস্তি ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাসের জেল। হুযূর (আঃ) এ বিষয়টি জানতেন না যে তিনি এ প্যাকেট অমৃতসরের যে প্রেসটিতে পাঠিয়েছিলেন উকিল রালিয়ারাম এর মলিক ছিল। সে প্যাকেটটি খোলার পর ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বিষয়টি ডাক বিভাগকে অবহিত করে। ফলে তাঁর (আঃ) বিরুদ্ধে মামলা হয়। ঐ দিনগুলোতেই তিনি (আঃ) স্বপ্ন দেখেন রালিয়ারাম তাঁকে (আঃ) দংশনের জন্য একটি সাপ প্রেরণ করেছে। কিন্তু হুযূর (আঃ) সেটিকে মাছের মত ভেজে খেয়ে ফেলেছেন।

মামলাটি আদালতে পেশ হলে হুযূর (আঃ)কে উকিলগণ পরামর্শ দিলেন, শাস্তি হতে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আপনি বলেন, এ চিঠিটি আমি প্যাকেটে রাখিনি। শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আমার এ চিঠিটি প্যাকেটে রালিয়ারাম নিজেই খামে রেখে দিয়েছে। হুযূর (আঃ) এ পরামর্শ শোনার পর বললেন, 'আমি নিজেই যখন চিঠিটি প্যাকেটে রেখেছি তখন শাস্তি হতে বাঁচার জন্য আমি কখনই এ কথা অস্বীকার করবো না'। এ কথা শুনার পর উকিলগণ বললো 'তাহলে শাস্তি হতে বাঁচার আর কোন পথ নেই।' হুযূর (আঃ) বললেন, 'যা হবে দেখা যাবে, আমি কোনক্রমেই মিথ্যা বলবো না'। মামলায় আদালত জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি চিঠিটি রেখেছেন?' হুযূর (আঃ) বললেন, 'হ্যাঁ আমি রেখেছি। আমি জানতাম না এমনটি করা ডাক বিভাগের পক্ষ হতে নিষেধ আছে।' বিরোধীরা আনন্দিত হলো হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) নিজেই স্বীকার করেছেন এখন তাঁকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু খোদার কুদরত দেখুন, বিচারক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সততায় প্রভাবিত হয়ে তাঁকে (আঃ) নির্দোষ আখ্যা দিল। সত্য বলার কারণেই আল্লাহ্তাআলা হুযূর (আঃ)-কে সম্মানের সাথে নির্দোষ সাব্যস্ত করলেন।

বড় ভাইয়ের মৃত্যু

১৮৮১ সনে তাঁর (আঃ) বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেব মৃত্যু বরণ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য তার জমিজমা সব হুযূর (আঃ) এর হস্তগত হয়। কিন্তু বিধবা ভাবী-র প্রতি সহানুভূতির কারণে তিঁনি (আঃ) এ জমিজমা গ্রহণ করেননি।

দ্বিতীয় বিবাহ

তাঁর (আঃ) দ্বিতীয় বিবাহ আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছায় ও ইলহামের

মাধ্যমে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৮৪ সনে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পুণ্যবতী কন্যা সাইয়্যেদা নুসরাত জাঁহান বেগম সাহেবার সাথে সম্পন্ন হয়। আর এভাবে এ ইলহামটি পূর্ণ হয় "আমার অভিপ্রায় আমি তোমার আরো একটি বিবাহ করাই। এ সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো"। (হায়াতে তাইয়্যেবা পৃঃ ৭৩) তাঁর (আঃ) শ্বশুরের নাম ছিল হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব। তিনি (নওয়াব সাহেব) দিল্লীর বিখ্যাত কবি খাজা মীর দরদ সাহেবের বংশধর ছিলেন। তিনি নিজেও একজন পুণ্যবান বুজুর্গ ছিলেন। দিল্লীর প্রখ্যাত আলেম মৌলভী সৈয়্যদ নজীর হুসায়েন দেহলবী ১৭ নভেম্বর ১৮৮৪ সনে তাঁর (আঃ) নিকাহ পড়ান। নিকহর পর পরই রুখসাতির অনুষ্ঠান হয়। আল্লাহ্‌তাআলার অঙ্গীকারানুযায়ী এ বিবাহ অত্যন্ত কল্যাণময় সাব্যস্ত হয়। এ বিবাহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে (আঃ) সুসংবাদপ্রাপ্ত প্রতিশ্রুত সন্তানাদি দান করেন। আর এ সুসংবাদসমূহ যথাসময়ে পূর্ণতা লাভ করে আর আজও পূর্ণতা পেয়েই চলছে।

সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তানাদি

এ ঘরে তাঁর (আঃ) দশজন সন্তান সন্ততি হয়। যাদের মধ্যে পাঁচজন শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। বাকী পাঁচজন হলো (১) হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ), জন্ম ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ মৃত্যু ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ (২) হযরত মির্যা বশীর আহমদ, কামরুল আম্বীয়া (রাঃ), জন্ম ২০ এপ্রিল ১৮৯৩ মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ (৩) হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ), জন্ম ২৪ মে ১৮৯৫ মৃত্যু ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬১ (৪) হযরত নবাব মুবারেকা বেগম সাহেবা (রাঃ), জন্ম ২ এপ্রিল ১৮৯৭ মৃত্যু ১৯৭৭ (৫) হযরত নবাব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা (রাঃ), জন্ম ২৫ জানুয়রী ১৯০৪ মৃত্যু ৬ মে ১৯৮৭।

মুজাদ্দিদ ও প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবী ঃ

১৮৮২ সনে তিনি তাঁর (আঃ) পুস্তক **বারাহীনে আহমদীয়া**-তে খোদার পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট হবার ইলহাম প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ সনের শুরুতে তিনি (আঃ) বিশ হাজার সংখ্যায় এক বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ঘোষণা দেন "ইলহামের বিরোধীগণ যদি ইসলামের সত্যতার নিদর্শন দেখতে চায় তবে তারা যেন আমার কাছে আসে। এ বিজ্ঞাপনে তিনি (আঃ) এ ঘোষণাও দেন যে, ইসলাম ও হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে এ যুগের মুজাদ্দেদ ও প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন।

বয়আতের ঘোষণা ও বয়আতের শর্তসমূহঃ

আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে ১৮৮৮ সনের পহেলা ডিসেম্বরে তিনি (আঃ) বয়াতের ঘোষণা দেন, 'যারা প্রকৃত ঈমান ও পবিত্রতা অর্জন করতে চায় তারা যেন আমার বয়াত করে'।

১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী, তিনি (আঃ) আরো একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এতে তিনি (আঃ) বয়াতের দশটি শর্তের বর্ণনা দেন।

শর্তগুলি হলো ঃ

- বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক হতে পবিত্র থাকবে।
- মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত অশান্তি ও বিদ্রোহের সব পথ হতে দূরে পবিত্র থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর শিকারে পরিণত হবে না।
- বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সাঃ) এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করবে ও ইস্তেগফার পড়বে, ভক্তিপ্লুত অন্তরে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর মহিমা ও প্রশংসা (বর্ণনা) করবে।
- উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।
- সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তাঁর পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর মিমাংসা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।
- সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।
- ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে।
- ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রকার প্রিয়জন হতে পিয়তর জ্ঞান করবে।

- আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করবে।
- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করবার প্রতিজ্ঞায় এ অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না। (ইশতেহার তাকমীলে তবলীগ, ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) এর ভক্তবৃন্দ বয়আত গ্রহণের জন্য সর্বদাই তাঁকে পীড়াপীড়ি করতেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বয়াত নিতে রাজী হন নি। তাদের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন "আমার সমুদয় কর্মতৎপরতা মহান আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত। অতএব তাঁর নির্দেশ ছাড়া কিছুই করতে পারব না।"

১৮৮৮ সনের ডিসেম্বরে ইসলামের মাধ্যমে তাঁর উপর বয়াত নেয়ার আদেশ অবতীর্ণ হয়। এ অনুযায়ী ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানায় সুফী আহমদজান সাহেবের বাড়ীতে সর্বপ্রথম বয়াত নেন। কাশ্মীর মহারাজার রাজ চিকিৎসক স্বনামখ্যাত আলেম হযরত আলহাজ্জ্ব হেকীম নূরুদ্দীন (রাঃ) সহ ৪০ জন এর মত বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। তাদের কয়েকজন হলেন হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্‌ সান্নুরী সাহেব হযরত চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব, হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব হযরত মুনশী আড়োড়ে খান সাহেব, হযরত কাযী জিয়াউদ্দিন সাহেব প্রমুখ।

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

কাদিয়ানে অবস্থানরত হিন্দু ও আর্য সমাজীরা প্রায়ই বলতো, বাইরেরর লোকদের আপনি কিছু নিদর্শন দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা আপনার প্রতিবেশি হিসেবে আমাদেকে এমন কোন নিদর্শন দেখান যাতে আমাদের কাছেও ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮৫ সনের শেষ দিকে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) কোন এক নির্জন স্থানে ৪০ দিন অবস্থান করে **"চিল্লা কাশীর"** মাধ্যমে বিশেষভাবে ইবাদত ও দোয়ায় রত হওয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। এ সময়ে তাঁর (আঃ) উপর ইলহাম হলো "তেরী উকদাহ কুশাই হুশিয়ারপুর মে যেগী" অর্থাৎ তোমার সমস্যার সমাধান হুশিয়ারপুরে হবে। অতঃপর হুশিয়ারপুর যাবার প্রস্তুতি নিলেন। ১৮৮৬ সনের শুরুতে হুশিয়ারপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শেখ মেহের আলী সাহেবের খামার বাড়ীর দোতলায় চিল্লাকাশি করার জন্য অবস্থান করলেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন (১) হযরত আব্দুল্লাহ্‌ সান্নুরী সাহেব (২) হযরত শেখ হামেদ আলী সাহেব (৩) হযরত মিয়া ফাতেহ খাঁ সাহেব। চিল্লাকাশি আরম্ভ করার পূর্বে তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন, এ ৪০ দিন বিশেষ দোয়াতে নিমগ্ন থাকার সময় কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। ৪০ দিন পর আরো ২০ দিন হুশিয়ারপুরে অবস্থান করবেন। তখন দেখা সাক্ষাৎ হবে। জুমুআর নামাযের জন্য একটি পরিত্যক্ত অনাবাদি নির্জন মসজিদ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

চিল্লাকাশি সমাপ্ত হবার পর ফেব্রুয়ারী আল্লাহ্‌ হতে প্রাপ্ত দোয়া কবুলিয়তের যাবতীয় সুসংবাদ সমূহ উল্লেখ করে ১৮৮৩৬ সনের ২০শে "সবুজ ইশতেহার" নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এটি 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী" নামে খ্যাত। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর ঔরশে আগামী নয় বছরে এক বিশেষ পুত্র সন্তান লাভ ও উক্ত সন্তান দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের ব্যাপক প্রচার ও উন্নতির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এর কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি তোমাকে এক রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। যেভাবে তুমি আমার নিকট চেয়েছো.....আমি তোমার দোয়াসমূহ কবুল করেছি। বিজয়ের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছো। হে বিজয়ী তোমার উপর সালাম, সুতরাং তোমাকে কুদরত এবং রহমতের নিদর্শন দেয়া হয়েছে যেন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ্‌র কালামের মর্যাদা লোকদের কাছে সুপ্রকাশিত হয়।.....অতএব তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে..... সে আল্লাহ্‌র নূর।..... ধন্য যে আকাশ হতে আসে..... সে কালেমাতুল্লাহ্‌ হবে।

(ইশতেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)

এ মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নয় বছরের মাঝে ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ সনে তাঁর (আঃ) পুত্র হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) নিজ পুস্তক **সিরাজে মুনীর** পুস্তকে ঘোষণা দেন, যে মহানসন্তানের সুসংবাদ আল্লাহ্‌তআলা আমাকে দিয়েছিলেন সে জন্মগ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) এর মাধ্যমে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। (চলবে)

মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

গ্রন্থ পুঞ্জি ঃ (১) হায়াতে তাইয়্যেবা (২) আহমদীয়্যা কি মুখতাসার তারীখ (৩) সীরাতে সুলতানুল কলম।

জামাত সমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

বিভিন্ন জামাতে ও অঙ্গসংগঠনে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপন

তাহেরাবাদ আহমদীয়া মুসলিম জামাত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী জাঁকজমক ভাবে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনসারুল্লাহ্ সংগঠনের রিজিওনাল নাযেম জনাব রাজিব উদ্দিন সাহেব। সভায় জামাতের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভায় খোদ্দাম আতফাল আনসার, লাজনা, নাসেরাত সহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং দোয়া করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

–প্রেসিডেন্ট, তাহেরাবাদ জামাত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চরসিন্দুর

-এর উদ্যোগে গত ২৩/০২/২০০৭ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমআ মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩ জনাব সাহাবউদ্দিন সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাছের আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব তাহের আহমদ, বক্তৃতা দেন জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব ন্যাশনাল সেক্রটারী উমুরে আমা ও জনাব জাহিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম। শেষে সভপতির ভাষণ ও দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করা হয়।

–মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
(মোয়াল্লেম)

লাজনা ইমাইল্লাহ্, ক্রোড়া

অদ্য ২৫-০২-২০০৭ইং তারিখ রোজ রবিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময়ে ক্রোড়া মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার পক্ষ হতে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাবা নার্গিস আক্তার প্রেসিডেন্ট লাঃ ইঃ ক্রোড়া। সর্বপ্রথম কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাবা রওশন আরা বেগম, নযম পাঠ করেন জনাবা শিউলী আক্তার। এরপর জনাবা সাবরীনা আক্তার (সুচী) মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মহান ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী, জনাবা নাসিরা আক্তার হ্যাপী হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেন। জনাবা নার্গিস আক্তার প্রেঃ লাঃ ইঃ ক্রোড়া ২০শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে বক্তব্য পেশ করেন।

অতঃপর সবশেষে স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম জনাব মুজাম্মেল হক সাহেব মুসলেহ মাওউদ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। দোয়া এবং সমাপ্তি ঘোষণার মাধ্যমে মুসলেহ মাওউদ দিবসের সভার কাজ শেষ হয়। এই সভায় লাজনা ও নাসেরাত সহ ২১জন উপস্থিত ছিলেন।

–রওশন আরা বেগম,
জেনারেল সেক্রেটারী

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ মাহীগঞ্জ

২০-০২-২০০৭ইং বাদ মাগরিব মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এর উদ্যোগে টেক্সদিঘীর পাড় মসজিদে, মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মসূচী শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ইসলাম, তাজুল ইসলাম, জনাব আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম এবং মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম, যয়ীম। সভায় আতফাল, খোদ্দাম, আনসার, লাজনা ও নাসেরাত সহ মোট ৫১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সভাশেষে উপস্থিত সদস্যদের মাঝে মিষ্টান্ন বিরতণ করা হয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত ২৩শে জানুয়ারী ২০০৭ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা-র উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালন করা হয়। এতে সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা রোকেয়া বেগম প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে–মোহতরমা সদর সাহেবা লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ ও মোহতরমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী। এরপর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তেলাওয়াতে কুরআন–ফায়েজা হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন–মোহতরমা সদর সাহেবা, দলীয় নযম পরিবেশন করেন–নাসেরাতগণ। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন–মোহতরমা মাকসুদা সামাদ, মাকসুদা রহমান ও সদর সাহেবা। মোহতরম রোকেয়া বেগম সাহেবার সমাপনী ভাষণ ও মোহতরমা মাকসুদা সামাদ চৌধূরী সাহেবার পরিচালনায় দোয়ার মাধ্যমে উক্ত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

–ফাতেমা নুসরাত, ইশায়াত সেক্রেটারী

কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান ঃ

২৩-০২-২০০৭ রোজ শুক্রবার বাদ জুমআ আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মাহীগঞ্জ টেক্সদিঘীরপাড় মসজিদে কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন জনাব আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম এবং মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম, যয়ীম। সভায় ৯ জন আনসার ৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিল। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ হয়।

–মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম (যয়ীম)

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, নারায়ণগঞ্জ এর ১৪তম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার ২০০৭ইং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ নারায়ণগঞ্জ এর এক দিন ব্যাপী ১৪তম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌ তাআলার রহমতে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা ইশরাত জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশ। মোহতরমা আমাতুল কাইয়ুম, নায়েব সদর-১, মোহতরমা সাদেকা হক, নায়েব সদর-২ মোহতরমা বুশরা হক, সেক্রেটারী তবলীগ মোহতরমা রেহানা খায়ের, সেক্রেটারী তজনীদ, মোহতরমা কামরুন নেছা, সেক্রেটারী নাসেরাত, মোহতরম মোবারেকা জাহান, অডিটর। উক্ত অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ মজলিসের নিকটস্থ দুইটি মজলিসের সদস্যা ও গয়ের আহমদী সহ মোট ১৫০ জন দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম মায়া এর সভানেত্রীত্বে সকাল ৯.৩০ মিনিটে ইজতেমা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, ইজতেমায়ী দোয়া ও আহাদ নামা পাঠের পর ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান মোহতরমা আবেদা চৌধুরী স্বাগত ভাষণ দেন। অত:পর স্থানীয় আমীর এডভোকেট মোহতরম তাইজ উদ্দিন আহমদ ইজতেমা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ইজতেমা অনুষ্ঠানে মজলিসের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জেনারেল সেক্রেটারী মোহতরমা উম্মে কুলসুম চায়না। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরমা কাউসার জাহান, মোহতরমা জুয়েল বেগম দিবা, মোহতরমা মরিয়ম বেগম কবিতা, মোহতরমা নূসরত জাহান মুন্নি, মোহতরমা মাকসুদা পারভেজ। সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশ, মোহতরমা ইশরাত জাহান ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ ইজতেমা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। সভানেত্রী মোহতরমা দিলরুবা বেগম মায়ার ভাষণের পর ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী মোহতরমা জুয়েল বেগম দিবা শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অতঃপর ইজতেমা উপলক্ষে বিভিন্ন তালিমী পরীক্ষা ও খেলাধূলায় পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

–উম্মে কুলসুম চায়না
জেনারেল সেক্রেটারী

আহমদী মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬১তম সালানা জলসা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন

মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ ফজলে দীর্ঘ ২১ বৎসর পর গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬১তম সালানা জলসা '০৭ অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ)।

উক্ত মহতী ও ঐতিহাসিক জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ১০.৩০ মিঃ। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শাহজাদা খান, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর উর্দু নযম সুললিত কণ্ঠে পাঠ করেন জনাব এহসান এলাহী রুবেল। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি। মাতৃভাষা ও আহমদীয়াত, এ বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব বশির আহম্মেদ মিঠু। আহমদীয়াত বিশ্বকে কি দিয়েছে? -এ বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মোবাশ্বের মুরব্বী।

অতঃপর দুপুরের খাওয়া দাওয়া ও নামায যোহর আসর একত্রে পড়ার পর বেলা ৩.০০ ঘটিকার সময় দ্বিতীয় ও সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, ঢাকা জামাত। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফিজুর রহমান হারুন। উর্দু কোরাস পাঠ করেন জনাব এহসানুল হাবীব জয় ও তার দল। ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মৌলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী। খাতামান নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অতুলনীয় মান ও মর্যাদা– বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মোবাশশেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব কাওছার আহম্মদ মঞ্জুর। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব ওয়াহিদুর রহমান, সেক্রেটারী জলসা কমিটি '০৭। সবশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ১ দিনব্যাপী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত মহতী জলসায় স্থানীয় জামাতসহ বিভিন্ন জামাত থেকে আগত মেহমানদের মাঝে অফুরন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছিল। স্থানীয় শিশুরা ছিল জলসার আনন্দে আত্মহারা। বাদ মাগরিব বিশেষ তবলিগী অধিবেশন হয়। এতে জেরে তবলিগ বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন মোহতরম মৌলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব, সদর মুরব্বী ও মোহতরম মোহাম্মদ সোলায়মান, মোবাশ্বের মুরব্বী। উক্ত তবলিগী অধিবেশনে জেরে তবলিগসহ প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিল। স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জলসার কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করেন। ফলে জলসা করতে কোন অসুবিধা হয় নাই। জায়গার

স্বল্পতার কারণে মসজিদে ও পার্শ্ববর্তী আহমদী ভাইদের বাড়ীতে MTA- এর মাধ্যমে জলসা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। জামাতে ১২০টি TVতে জলসা সম্প্রচার করা হয়। ফলে স্থানীয় ও আগত মেহমানরা ঘরে বসেও জলসা দেখতে পান।

জলসার সংবাদ স্থানীয় ৭টি দৈনিক পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাসমূহ হল ঃ দৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হালচাল, সমতট, বার্তা, তিতাস কণ্ঠ ও প্রজাবন্ধু ইত্যাদি। এছাড়াও ৩টি জাতীয় দৈনিক সমকাল, আমাদের সময় ও ভোরের কাগজ পত্রিকায় জলসার সংবাদ প্রকাশিত হয়।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার
চেয়ারম্যান
জলসা কমিটি '০৭

ভুল সংশোধন

৮৩তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা ৩১শে জানুয়ারী ২০০৭ এর **'পাক্ষিক আহমদী'**তে প্রকাশিত "চিরঞ্জীব আল কুরআন" প্রবন্ধের সংখ্যা তাত্বিক উদাহরণ হিসেবে বর্ণিত উক্ত পাক্ষিকের ৩৪ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনটি তথ্যগতভাবে অসম্পূর্ণ এবং **১৩৩ ও ২৯ সংখ্যা দুটি অশুদ্ধ**। এর স্থলে পূর্ণ বাক্যটি এইভাবে পড়বেন- "এ অক্ষরটি এ সূরায় আছে **১৩১ বার** এবং **সূরার নাম 'আল কালাম'** 'এর ক্বাফ' অক্ষরটি আছে ২১ বার। এই উভয় **অক্ষরের সংখ্যা সমষ্টি ১৫২, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য**"। অসাবধানতা বশতঃ ভুল হওয়ায় লিখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

শুভ বিবাহ

গত ০২-০৩-২০০৭ইং শুক্রবার আহমদীয়া মুসলীম জামাতের ঢাকাস্থ বকশীবাজার কেন্দ্রীয় মসজিদে নিউজিল্যান্ড প্রবাসী ছলিম আহমদ হাজারীর একমাত্র কন্যা হাজারী সুহানা ছলীম (লিনা)র সহিত ঢাকা নিবাসী জনাব বরকত উল্লাহ পাটোয়ারী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মোঃ বশীরুদ্দিন (সুমন) এর বিয়ে ৭০০০০১/- (সাত লক্ষ এক) টাকা দেনমোহরানায় সুসম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। বিয়ের এলান করেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতারম মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব। উল্লেখ যে, কনে একজন মূসী এবং বিয়ের দিনেই কনে কর্তৃক মরিয়ম শাদী ফান্ডে ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা চাঁদা প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাতা ভগ্নীগণের খেদমতে নব দম্পতির সামগ্রিক দ্বীনি ও দুনিয়াবী কল্যাণের জন্য বিশেষ দোয়া প্রার্থী।

ছলিম আহমদ হাজারী
১১১ এশ্ ষ্ট্রিট
এভনডেল, অকল্যান্ড
নিউজিল্যান্ড।

কবিতা

বিশ্ব জুড়ে অবক্ষয় ও প্রতিকার

বিশ্ব জুড়ে অবক্ষয় কারে বলি কারে শুধাই,
যে ক্ষয় মানবতার ক্ষয়, যে ক্ষয় নৈতিকতার ক্ষয়,
যে ক্ষয়ে বিশ্ব অন্ধকারময়।
খোদা বিমুখতাই অবক্ষয়, সে ক্ষয় আধ্যাত্মিক ক্ষয়,
অবক্ষয়ের প্লাবন দেখে মনেরই ব্যাথায়, মক্কা হতে দ্বীনের রাসূল মদীনাতে চলে যায়,
এ ব্যাথা বিষাদময়।
'আখেরী যামানার অবক্ষয়, এ ক্ষয় তামাম বিশ্বময়।
মানুষ মানুষে নাই সম্প্রীতি, নাই মানুষের খোদাভীতি,
তাকওয়া হারায়ে মানুষ করে বাগোআতি।
ইসলামের এই দুর্দিনে, অক্ষয় হতাশার দিনে–
পাঠালেন রহমান খোদা মাহদীরে এই দুনিয়ায়, যিনি যুগ ইমাম,
১৪শ হিজরীর প্রতিশ্রুত ইমাম, ইমাম মাহদীয়ান।
তিনিই মৈত্রেয়, তিনিই কলকী অবতার
তারে পৌঁছান নবীর সালাম এতায়াত করুন তাঁর
যিনি যুগের সতর্ককারী বাশিরাঁও নাজিরাঁও
ন্যায় বিচার মিমাংসাকারী হাকামান।
দুর্নীতি দুর্যোগ মানুষের দুর্ভোগ,
সতর্ককারী না মানিলে দুর হবে না ঐশী কোপ।
একথা কুরআনে কয়, একথা নবীর গোলাম মসীহ্ মাওউদ কয়,
আকাশের আলোর কাছে চোখের আলো অচল হয়
আকাশের জ্ঞানের কাছে দুনিয়ার জ্ঞান কিছু নয়
ঐশী জ্ঞানে চললে পরে দুর হবে ভাই অবক্ষয়, নয়ন মেলে দেখতে পাবে নবীর ইসলাম জ্যোতির্ময়।
শুনেন ভাই মুমেন' যত ভবের যত ইনসান তাকওয়ার পোশাক পড়,
গায়েবে আন ঈমান।
তোমরা হও মুত্তাকিন, গায়েবে আন একিন।
যুগ মাহদীর দীক্ষা ধর, দশ শর্ত আমল কর,
খেলাফতের রজ্জু ধর, খোদার সন্তুষ্টি হাসিল কর,
জিন্দা কর দ্বীন ইসলাম অবক্ষয়ের এইতো সমাধান।
ইসলামের হবে বিশ্ব বিজয়, এ কথা কুরআন কয়
এ কথা নবীর গোলাম, মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কয়।
গণক ও জোতিষির কথা অনেকই তো মিথ্যা হয়, খোদা ও রাসূলের কথা সবইতো সত্য হয়।
দুনিয়ার যত অবক্ষয়
মিটে যাবে খলীফাতুল মাহদীর সু সময়।

–জয়নাল আবেদীন

জলই জীবন / WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ -মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি

রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি

খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সুচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN,
PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
بيت الله
كتاب الله
৬৩তম জলসা সালানা ২০০৭
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া, তারিখ: ২, ৩ মার্চ, রোজ শুক্র ও শনিবার
63rd JALSA SALANA 2007
MADIYYA MUSLIM JAMAT, TARUA, Date: 2nd, 3rd March, Fri & Satar day
সমাপনী অধিবেশন

New Vol. No. 69 ■ 17th Issue
Fortnightly

The AHMADI

15 March, 2007. ■ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 e-mail: amgb@bol-online.com